স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৫ম বর্ষ ❑ চতুর্থ সংখ্যা ❑ এপ্রিল-মে ২০১৬

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ নিত্য দাস, মনোজ দে ,
গোপাল সরকার,
দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু
বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
গোপাল সরকার
স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র তরফে
দাসপাড়া (আংশিক), পূর্ব বুড়িখালি, বাউরিয়া
উলুবেড়িয়া,
হাওড়া ৭১১৩১০

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৬
ফোন : ২২৫২-৭৮১৬ / ৩৭০৯ / ৯১৬৭

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

থাইরয়েডের রোগ

আমাদের দেশে দশজন মানুষের মধ্যে একজন থাইরয়েডের রোগে ভোগেন। সময়ে রোগ না ধরতে পারলে, চিকিৎসায় বেশি দেরি হলে, অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়। প্রসূতি মায়ের গর্ভস্থ শিশু জড়বুদ্ধি হয়ে যেতে পারে।

থাইরয়েডের রোগের মূল ধরন দু-রকম। থাইরয়েড হরমোন কম নিঃসৃত হলে হাইপোথাইরয়েডিজম হয়—এটা নিয়ে লিখেছেন ডা. সুমিত দাস। ৪

থাইরয়েড হরমোন বেশি নিঃসৃত হলে হয় হাইপারথাইরয়েডিজম ও থাইরোটক্সিকোসিস—এ রোগ নিয়ে লিখেছেন ডা. পুণ্যব্রত গুণ। ৬

হার্ট যখন বিকল

ক-দিন আগেও সিনেমাতে নায়িকা বাবার না-পসন্দ ছেলেকে বিয়ে করতে চাইলে বাবার হার্ট ফেল করত। সেসব দেখে আমাদের ‘হার্ট ফেল’ সম্পর্কে ধারণাটাই গুবলেট হয়ে গেছে। ডাক্তাররা হার্ট ফেলিয়োর বলতে কী বোঝান, আর সেটা কেন জানা দরকার, বুঝিয়ে দিচ্ছেন ডা. মৃন্ময়। ১৩

ইডিমা বা শরীরে জল জমে ফোলা

সন্ধ্যেবেলা পা ফুলছে, আঙুল দিয়ে টিপলে টোপা কুলের মতো ডেবে যাচ্ছে? কিংবা দিনের শুরুতে ফুলছে নাকি চোখের পাতা? নাকি জল জমেছে পেটে? ডাক্তার বলবেন, ‘ইডিমা’। কিন্তু কেন ইডিমা? কী ই-বা করবেন সেটা নিয়ে? লিখেছেন ডা. কুশল সেন। ১৫

সকলের জন্য স্বাস্থ্য—কোনো আকাশকুসুম কল্পনা নয়—বলেছেন ডা. শ্রীনাথ রেড্ডি ২০

এদেশের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার হাল হকিকত প্রসঙ্গে—অমর্ত্য সেন ২২

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখা পড়ে কেউ নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না, করলে সেই চিকিৎসার ফলে যে অসুবিধা বা বিপদ ঘটতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবেই সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সেজন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়		৩
হাইপোথাইরয়ডিজম	ডা. সুমিত দাশ	৪
হাইপারথাইরয়েডিজম আর থাইরোটক্সিকোসিস	ডা. পুণ্যব্রত গুণ	৬
ডাক্তারের মোহভঙ্গে ক্ষতিটা সবার	ডা. গৌতম মিস্ত্রী	৮
হার্ট যখন বিকল	ডা. মৃন্ময় বেরা	১৩
ইডিমা বা শরীরে জল জমে ফোলা	ডা. কুশল সেন	১৫
শিশু বিনোদনে কার্টুনের ভূমিকা ও প্রভাব	রুমঝুম ভট্টাচার্য	১৮
লাইকেন প্লেনাস	ডা. শর্মিষ্ঠা দাস	১৯
সকলের জন্য স্বাস্থ্য কোনো আকাশকুসুম কল্পনা নয়		২০
এ-দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার হালহকিকত প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেন		২২
লাতিন আমেরিকার স্বাস্থ্য আন্দোলন—দুই ডাক্তারের গল্প সত্য শিবরমণ		২৪
কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন		২৭
সমস্যার নাম বন্ধ্যাত্ব	ডা. পুণ্যব্রত গুণ	২৮
ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে	প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	২৯
ডাক্তারি পাশ, তবে ডাক্তার নই	অপালা ভট্টাচার্য	৩৩
বাজার থেকে কেনা	ডা. নীহার রঞ্জন মণ্ডল ও শ্রী শুভদীপ মল্লিক	৩৫
রান্নাঘরে রান্না	ডা. নীহার রঞ্জন মণ্ডল ও শ্রী শুভদীপ মল্লিক	৩৭
স্বাস্থ্যসম্মত রান্না	ডা. নীহার রঞ্জন মণ্ডল	৩৯
হাঁটু ব্যথার উপশম কি সম্ভব?	ডা. অসিত রঞ্জন গোসাই	৪৭
পুকুর-নদী থেকে পানযোগ্য জল সংগ্রহ	মানসরঞ্জন মাইতি	৫০
টুকরো খবর		
ওষুধ কোম্পানিগুলো বিক্রি বাড়ানোর জন্য মেডিক্যাল ক্যাম্প করে		৫৩
সামুদ্রিক প্রাণীর সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেছে		৫৪
ভিডিও গেমস		৫৪
খাদ্য-সাপ্লিমেন্ট স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে		৫৫
হরেকরকম		
মধু লেবু খেয়ে কি রোগা হওয়া যায়		৫৬

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল

পাতিরাম
বুকমার্ক
পিপলস বুক সোসাইটি
বই-চিত্র
মনীষা গ্রন্থালয়
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট

কলকাতার অন্যত্র

অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ)
এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)
লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭,
কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়)
বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (উত্তর কলকাতা)
জ্ঞানের আলো (যাদবপুর, কলকাতা-৩২)

কলকাতার বাইরে

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ)
পুষ্প নিউজ এজেন্সি (মালদহ, ফোন ৯৯৩২৯৬৭৯৯১)
জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮)
প্রয়াস মল্লভূম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯)
মাধব পেপার স্টল, (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৪৫৫২৪৪)
প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২)
আনন্দম (মাথাভাঙা, বরুণ সাহা, ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২
সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৯১৪৩২৪৫৯৩৭)

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন:
৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭
পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭
ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

***'স্বাস্থ্যের বৃত্তে'*-র গ্রাহক হোন।**

সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।

Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন
অথবা
NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে
Swasthyer Britto
A/c No.0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code: CNRB0000315

সম্পাদকীয়

মোটা হয়ে যাচ্ছেন? থাইরয়েডের অসুখ হতে পারে। রোগা হচ্ছেন? থাইরয়েডের রোগ থেকে কি না চেক করে নিন। চুল পড়ে যাচ্ছে? থাইরয়েড দেখান। বাচ্চা স্কুলে ঠিকঠাক পড়া শিখছে না? থাইরয়েডের অবস্থাটা ঠিক আছে তো? বেশি ঘামছেন? হয়তো-বা থাইরয়েড। শীত করছে নাকি এই বসন্তেও? থাইরয়েড। বারবার 'বড়ো বাইরে' যেতে হচ্ছে? থাইরয়েড নয়তো? খুব কোষ্ঠকাঠিন্য? থাইরয়েড থেকে হয় ওরকম, জানেন না বুঝি? মাসিকের সময় বেশি রক্ত পড়ছে? থাইরয়েড মাপুন। মাসিকে রক্ত খুব কম পড়ে নাকি? অবশ্যই থাইরয়েড মাপবেন।

আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না? আমরা একবার দেখি থাইরয়েডের রোগে কী হয়, আর কেনই-বা থাইরয়েড রোগে দুটো বিপরীত রকমের লক্ষণ দেখা যেতে পারে। আসলে থাইরয়েডের রোগ প্রধানত দু-রকম। শরীরে থাইরয়েড হরমোন কম হলে একরকম রোগ—ডাক্তারদের পরিভাষায় হাইপোথাইরয়েড। আর যদি থাইরয়েড হরমোন বেশি হয়ে যায় তা হলে অন্যরকম রোগ—ডাক্তারদের পরিভাষায় হাইপারথাইরয়েড। কথা-দুটো শুনতে কাছাকাছি, ডাক্তারবাবুদের কাছে শোনা নানা নতুন ডাক্তারি শব্দ অনেক সময়েই গুলিয়ে যায়। তাই আমজনতার কাছে প্রায়শই এই খবরটা পৌঁছোয় না যে থাইরয়েডের প্রধান দুটো রোগ একেবারেই উলটো চরিত্রের। একটা রোগে মোটা হবার প্রবণতা বাড়লে অন্য রোগে রোগা হবারই কথা, একটাতে যখন-তখন গরম লাগলে অন্যটাতে শীতকাতুরে হওয়াই স্বাভাবিক।

তবে পাঠকের মনে হতে পারে, থাইরয়েডের অসুখ আগে তো এত দেখা যেত না, এখন কি বাড়ছে? আমরা *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পাতায় আগে দেখেছি, এ দেশে ডায়াবেটিস বেড়েছে, বেড়েছে উচ্চ রক্তচাপ; কেননা আমাদের জীবনযাত্রা আর খাদ্যাভ্যাসের বেশ কিছু অস্বাস্থ্যকর পরিবর্তন ঘটেছে বিগত কয়েক দশকে। থাইরয়েডের রোগের ক্ষেত্রেও সেরকম ব্যাপার হয়তো কিছু থাকতেও পারে, কিন্তু তার খুব সুনির্দিষ্ট প্রমাণ এতাবৎ মেলেনি। যেটা প্রমাণিত সত্য তা হল এই যে, থাইরয়েডের রোগ এ দেশে খুব উচ্চ সংখ্যায় আছে; মোট জনসংখ্যার দশজনের মধ্যে মোটামুটি একজনের কোনো-না-কোনো থাইরয়েডের রোগ আছে। আর এদেশে এ-রোগ নিয়ে সচেতনতা ভীষণ কম, বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে। এ-রোগ দ্রুত ধরে ফেলে চিকিৎসা করলে রোগী ভালোই থাকেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে সে-সুযোগ মেলা দায়। উপরন্তু মায়ের থাইরয়েড রোগ উপেক্ষিত থাকায় বাচ্চার অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে চলছে এঁদের ঘরে ঘরে। আরএসবিওয়াই (Rashtriya Swasthya Bima Yojana) জাতীয় সরকারি ব্যবস্থা এ-রোগে কোনো কাজেই আসবে না, কেননা এতে হাসপাতালে ভর্তি হবার ব্যাপার নেই, আছে দিনের পর দিন দামি ওষুধ কিনে খাওয়া আর ল্যাবকে নগদ পয়সা দিয়ে বেশ খরচসাপেক্ষ পরীক্ষা করানো—এর পয়সা আরএসবিওয়াই বা কোনো স্বাস্থ্যবিমা দেয় না।

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে যেখানে হাইপোথাইরয়েড রোগ মাত্র শতকরা দু-জনের, মার্কিনদেশে শতকরা ৪ থেকে ৬ জনের, সেখানে ভারতে কেন ১০ জনের, তার ব্যাখ্যা মেলা ভার। বিশ্বখ্যাত ডাক্তারি জার্নাল *দ্য ল্যান্সেট* এই সংখ্যাতত্ত্ব তুলে বলছে, আয়োডিনযুক্ত লবণের বহুল ব্যবহার করে এ-রোগ আটকানো যাবে বলে ভাবা হয়েছিল, তা হয়নি; উপরন্তু, আয়োডিনযুক্ত লবণ থাইরয়েড সমস্যা বাড়িয়েও থাকতে পারে, অন্তত সাময়িকভাবে। চাষে ব্যবহৃত কীটনাশক ও নানা অন্য পলিউশনও থাইরয়েড সমস্যার জন্য দায়ী হতে পারে, এমন সন্দেহ করেছেন অনেক বিশেষজ্ঞ। কিন্তু যথাযথ সমীক্ষা হয়নি।

অসুখ-ওষুধ নিয়ে বলতে গেলে কেবল প্রচলিত ডাক্তারিবিদ্যার কথাগুলো মুখস্থ বলাই যথেষ্ট হয় না। থাইরয়েডের মহামারী কারও কারও পক্ষে বড়ো লাভের ব্যাপার। হাইপোথাইরয়েডের ওষুধ থাইরক্সিন। এই সংখ্যাতেই পাঠক পড়বেন, অ্যাবট নামক বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির 'থাইরোনর্ম' (থাইরক্সিন) অন্য সব ব্র্যান্ডের চাইতে বেশি দামি হওয়া সত্ত্বেও অন্য সব ব্র্যান্ডের চেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে। জাইডাস ক্যাডিলা-ও বেশ বড়ো কোম্পানি, তাদের থাইরক্সিন ব্র্যান্ড 'রক্সিন'-এর ১০০টির দাম ১১ টাকা আর অ্যাবট-এর ১০০টি 'থাইরোনর্ম'-এর দাম ১৫১ টাকা; ১৫ গুণ! আর এই দামি ওষুধ ডাক্তারবাবুরা প্রেসক্রিপশনে লিখছেন কেন? লিখছেন, কেননা অ্যাবট-এর বাজার ধরার কায়দা 'ফ্রি' ক্যাম্প করে 'বড়ো' ডাক্তারদের সঙ্গে এক মিথোজীবিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা খুব কার্যকর। একবার বাজারে দাঁড়িয়ে গেলে অন্য গড়পড়তা ডাক্তাররাও দামি না সস্তা সেটা দেখার তাগিদ অনুভব করেন না, ''চালু মানেই ভালো'', ''দামি যখন ভালো হবে'', ''বড়ো কোম্পানির জিনিস ভালো''—এই অপবিশ্বাসের শিকার হয়ে রোগীর ঘাড়ে বাড়তি দাম চাপিয়ে দিচ্ছেন।

এইসব নানা ভুল ধারণা আর ধাঁধার জট ছড়ানোর চেষ্টা করছে এবারের *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*।

হাইপোথাইরয়ডিজম

থাইরয়েড-এর রোগ নিয়ে আগে তেমন সচেতনতা ছিল না, পরীক্ষা করে রোগ ধরাও ছিল কঠিন। এখন পরীক্ষা সহজলভ্য হবার পর থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের মধ্যে থাইরয়েডের রোগ খুব বেশি, আর তার বেশিরভাগই হল হাইপোথাইরয়েড—লিখেছেন **ডা. সুমিত দাশ**।

আমার দিদির তো থাইরয়েড বেড়ে গেছে। তোমাকে একটু ফোলা লাগছে—থাইরয়েড বেড়ে গেছে কিনা পরীক্ষা করে নাও। আমার মন খারাপ লাগছে, ডাক্তার থাইরয়েড পরীক্ষা করতে দিল—বলে কিনা এর থেকেও হয়। কে জানে! এই ধরনের কথাবার্তা ট্রেনে, বাসে খুবই শোনা যায়। কিন্তু 'থাইরয়েড বেড়ে যাওয়া'টা আসলে কী? আসলে কিন্তু বাড়া নয় কমা। হাইপো কথার অর্থ 'কম'। এই রোগটাতে থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরয়েড হরমোন নিঃসরণ কমে যায় অর্থাৎ থাইরয়েড গ্রন্থির সক্রিয়তা কমে যায়। তাই রোগটার নাম হাইপোথাইরয়ডিজম। তা হলে পথে ঘাটে ডাক্তারের চেম্বারে 'বেড়ে গেছে' বলে কেন? থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত TSH (থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন—সংক্ষেপে টিএসএইচ)। রক্তে এটা বেড়ে যায় বলে সাধারণ মানুষ বেড়ে যাওয়াই বলেন।

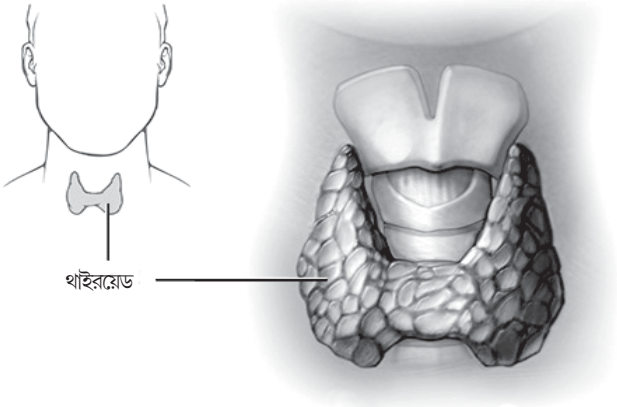

চিত্র ১. থাইরয়েড গ্রন্থি

থাইরয়েড গ্ল্যান্ড কী করে কাজ করে

আমাদের গলার সামনে থাকে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। দু-টি অংশকে বলে 'লোব'। আর সংযোগকারী অংশকে বলে 'ইস্থমাস'। সাধারণভাবে হাত দিয়ে থাইরয়েড গ্রন্থি বোঝা যায় না। বড়ো হলে তবে হাতে বোঝা যায়। আর আরও বড়ো হলে চোখে দেখে বোঝা যায়।

থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে আয়োডিনযুক্ত দু-টি হরমোন বেরোয়। একটির নাম T_3 (ট্রাই আয়োডোথাইরোনিন)—এটাতে তিনটি আয়োডিন পরমাণু থাকে। আর একটার নাম T_4 (টেট্রা আয়োডোথাইরোনিন) এটাতে চারটে আয়োডিন পরমাণু থাকে। শরীর ও মন ঠিক রাখতে হরমোন দু-টির প্রয়োজন হয়। আর থাইরয়েড গ্রন্থিকে নিয়ন্ত্রণ করে পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন TSH (থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন) যার কথা আগেই বলা হয়েছে।

থাইরয়েড হরমোন তৈরির জন্য দিনে মোটামুটি ১৫০ মিলিগ্রাম আয়োডিন লাগে। এই পরিমাণ আয়োডিন মাটিতে হওয়া শাকসবজি, মাছ (বিশেষত সামুদ্রিক মাছ), ফল থেকে পাওয়া যায়। পাহাড়ের মাটিতে কম আয়োডিন থাকে। কারণ পাহাড় সমুদ্র থেকে অনেক দূরে থাকে আর হাজার হাজার বছর ধরে বর্ষাতে ধুয়ে পাহাড়ের মাটি থেকে আয়োডিনের মাত্রা কমে যায়। তাই পাহাড়ের মানুষদের মধ্যে আয়োডিনের অভাবজনিত থাইরয়েডের রোগ দেখা যায়। খাওয়ার লবণের সঙ্গে অনেক-ক্ষেত্রেই আয়োডিন মিশিয়ে বিক্রি করা হয়। কিন্তু সবাইকে এই গণহারে আয়োডিন খাওয়ানোও যুক্তিযুক্ত নয়, তাতে অতিমাত্রায় থাইরয়েড হরমোন নিঃসৃত হয়ে অন্য রোগ হতে পারে।

রোগ লক্ষণ

কিশোর বয়স থেকে আরম্ভ করে যেকোনো বয়সেই হাইপোথাইরয়ডিজম হতে পারে। মানুষের মস্তিষ্কের সবথেকে বেশি বৃদ্ধি হয় ২ থেকে ৮ বছর বয়সের মধ্যে। তাই এই সময় থাইরয়েড হরমোনের অভাব হলে বাচ্চার বুদ্ধি কম হয় এবং আকারেও বামন হয়। গর্ভবতী মহিলার হাইপোথাইরয়েড থাকলে বাচ্চার হাইপোথাইরয়েড হতে পারে। বুদ্ধি কম বা বামন একবার হয়ে গেলে আর চিকিৎসা করে বাচ্চার বিশেষ লাভ হয় না, তাই গর্ভবতী মায়ের হাইপোথাইরয়েড থাকলে তার সঠিক চিকিৎসা করা উচিত।

হাইপোথাইরয়েড রোগীর থাইরয়েড বড়ো হতে পারে আবার ছোটোও হতে পারে—সাধারণত কিশোরদের বড়ো হয় বয়স্কদের ছোটো হয়। ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলো জাতীয় খাবারে একরকম রাসায়নিক পদার্থ ('গয়েট্রোজেন') থাকে যা থাইরয়েডের কাজে বাধা দেয়। এই জাতীয় খাবার বেশি খেলে অনেকের হাইপোথাইরয়েড রোগ হয়। এ ছাড়া লিথিয়াম জাতীয় ওষুধ খেলেও হাইপোথাইরয়েড হতে পারে।

যে উপসর্গগুলো চিনতে হবে

১. চুল পড়ে যাওয়া।
২. শরীরের ওজন বৃদ্ধি।
৩. চামড়া মোটা ও খসখসে হওয়া।
৪. গলার স্বর ভেঙে যাওয়া, আস্তে আস্তে কথা বলা।
৫. ঠান্ডা সহ্য করতে না পারা।

৬. অল্পতে ক্লান্ত হয়ে পড়া।
৭. মনমেজাজ খারাপ থাকা।
৮. মনোযোগের অভাব।
৯. হাতে পায়ে ঝিনঝিন।
১০. কানে কম শোনা।
১১. বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট এবং রক্তচাপ বেশি হতে পারে।
১২. মেয়েদের বেশি রজঃস্রাব এবং বন্ধ্যাত্ব হতে পারে।
১৩. হৃদ্‌স্পন্দনের গতি কমে যায় অর্থাৎ পাল্‌স রেট কমে।
১৪. দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা না করলে রোগীর শরীরে বিভিন্ন জায়গায় এক বিশেষ ধরনের শর্করা, মিউকোপলিস্যাকারাইড জমে যায়। শরীর ফুলে যায়। এই ফোলা টিপে দেখলে সেই জায়গাটা ডেবে যায় না, তাই একে ননপিটিং ইডিমা (Non-pitting oedema) বলে।

পরীক্ষানিরীক্ষা

হাইপোথাইরয়েড হয়েছে কিনা সেটা বোঝার জন্যে রক্তে দুইরকম থাইরয়েড হরমোন (T_3 ও T_4) এবং TSH-এর মাত্রা দেখতে হবে। রক্তে নিঃসৃত থাইরয়েড হরমোন বেশির ভাগটাই (৯৯ শতাংশের বেশি) এক বিশেষ প্রোটিনের (TBG Thyroid Binding Globulin) সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিন্তু যে ন্যূনতম পরিমাণ থাইরয়েড হরমোন 'মুক্ত' অবস্থায় থাকে সেটাই বিভিন্ন বিপাকক্রিয়ায় কাজ করে। তাই মুক্ত T_3, T_4 (Free T_3, Free T_4) মাপা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পিটুইটারি গ্রন্থির রোগ না থাকলে T_3, T_4-এর মাত্রা এবং TSH ব্যস্তানুপাতে থাকে। অর্থাৎ T_3, T_4 কমলে TSH বাড়ে এবং উলটোটা। T_3, T_4-এর মাত্রার সামান্য পরিবর্তন TSH-এর মাত্রার অনেক পরিবর্তন ঘটায়। T_4-এর স্বাভাবিক মাত্রা হচ্ছে ৯-২১ pmol/l, যার অন্তত 15 pmol T_4 আছে তার যদি 5 pmol বাড়ে বা কমে তবে TSH একদিকে রক্তে প্রায় শূন্য হয়ে যাবে যা অপরদিকে প্রচুর বেড়ে যাবে। তাই হাইপোথাইরয়ডিজম বোঝার জন্যে TSH-কে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বা সংবেদনশীল ধরা হয়।

থাইরয়েড গ্রন্থির টিউমার বা অন্য কোনো রোগ সন্দেহ করলে প্রয়োজনে

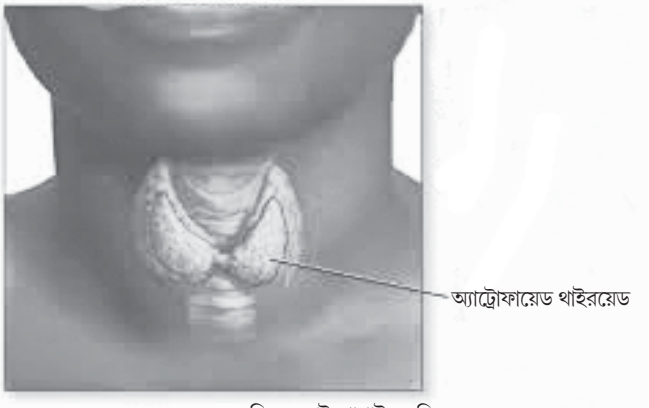

চিত্র ২. হাইপোথাইরয়েডিজম

আল্ট্রাসোনোগ্রাম বা সিটি স্ক্যান করা হয়। এ ছাড়া রেডিও আইসোটোপ দিয়ে এক বিশেষ পরীক্ষা করা যেতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে FNABC (Fine needle aspiration boiopsy and cytology) অর্থাৎ সূচ দিয়ে থাইরয়েডের কোষ কলা টেনে পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়।

চিকিৎসা

যেহেতু থাইরয়েড হরমোনের অভাব হল রোগের কারণ তাই হাইপোথাইরয়ডিজমের মূল চিকিৎসা হচ্ছে বাইরে থেকে থাইরয়েড হরমোন জোগান দেওয়া থাইরক্সিন) T_4 বড়ি হিসাবে পাওয়া যায়। সাধারণত ২৫ মাইক্রোগ্রাম থেকে শুরু করে ১৫০ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত সকালে খালি পেটে খেতে হয়। দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে কিছুটা উন্নতি হয়, তবে প্রকৃত উন্নতি হতে তিন থেকে ছয় মাস লেগে যায়। গর্ভধারণকালীন এই ওষুধ তো চলবেই বরং ওই সময় ওষুধের প্রয়োজন বেড়ে যায়—তাই আরও ৫০ মাইক্রোগ্রাম থাইরক্সিন অতিরিক্ত যোগ করা উচিত। ওষুধ কতদিন চলবে নির্ভর করে রোগ লক্ষণ কতটা নির্মূল হল আর থাইরয়েড গ্রন্থির অবস্থা বুঝে। থাইরয়েড গ্রন্থির অবস্থা যদি এমন হয় কখনোই আর স্বাভাবিক কাজ করতে পারবে না তো সারাজীবন ওষুধ খেতে হবে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সুমিত দাশ, এমবিবিএস, ডিপিএম, শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের মনোরোগবিশেষজ্ঞ।

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী
একুশ শতকের যুক্তিবাদী
একুশ শতকের যুক্তিবাদী
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র
৩১, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬
যোগাযোগ : ৯৮৩৬৪৭৭১৯৫, ৯৮৩০৬৭৩৫১২
এছাড়া কমবয়সীদের জন্য আছে আকর্ষণীয় গল্প-ফিচার-ছবিতে ঠাসা কিশোর যুক্তিবাদী

হাইপারথাইরয়েডিজম আর থাইরোটক্সিকোসিস

থাইরয়েড গ্রন্থি যেমন কম কাজ করতে পারে, তেমনি বেশি কাজও করতে পারে। তেমনটা হলে রোগীর কী অসুবিধা হয়, কেমন করে রোগ-নির্ণয় করা হয় আর তার চিকিৎসাই-বা কী—লিখেছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

থাইরয়েডের রোগ বলতে সাধারণত মানুষ থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোনের কম কাজ করাকে বোঝান। তাঁদের দেখা রোগীদের মধ্যে অধিকাংশই থাইরয়েডের কম কাজের রোগী। কিন্তু থাইরয়েড-এর অন্যরকম রোগে এর উলটোটাও হতে পারে। থাইরয়েড অতিক্রিয়া বা থাইরোটক্সিকোসিস বলা হয় সেই অবস্থাকে যখন থাইরয়েড হরমোন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মাত্রায় রয়েছে। আর হাইপারথাইরয়েডিজম বলা হয় তখন, যখন থাইরয়েড গ্রন্থি বেশি কাজ করছে। হাইপারথাইরয়েডিজম আর থাইরোটক্সিকোসিস-এর অর্থ সব সময় এক নয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে থাইরোটক্সিকোসিস গ্রেভস' ডিজিজ (Graves' disease), অতিক্রিয়া-যুক্ত বহুবিম্বক গলগণ্ড (toxic multi-nodular goiter), অতিক্রিয়াযুক্ত গ্রন্থি-অর্বুদ (toxic adenoma) ইতাদি রোগ থাইরয়েড গ্রন্থির অতিক্রিয়ার জন্য হয়।

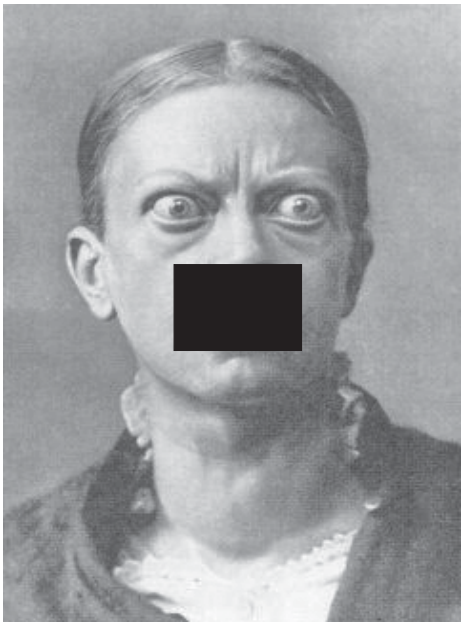

চিত্র ১. গ্রেভস' ডিজিজ

গ্রেভস' ডিজিজ হলে পুরো থাইরয়েড গ্রন্থিটাই প্রায় সমানভাবে বড়ো হয়। গ্রন্থির ভিতরে রক্ত চলাচল খুব বেড়ে যায়, এতটাই বাড়ে যে কখনো-কখনো স্টেথোস্কোপ বসিয়ে রক্ত চলাচলের আওয়াজ শোনা যায়। শরীরে তৈরি হওয়া কিছু অ্যান্টিবডি থাইরয়েডের কোষগুলোকে অতিরিক্ত হরমোন তৈরি করতে প্ররোচিত করে। এই বেশি হরমোন তৈরি হওয়া আবার আপনা থেকেই কমে বাড়ে। দীর্ঘদিন ধরে বেশি হরমোন তৈরি করতে করতে অনেক সময় থাইরয়েড গ্রন্থি ক্লান্ত হয়ে গিয়ে স্বাভাবিক পরিমাণে হরমোনও তৈরি করতে পারে না। অর্থাৎ গ্রেভস' ডিজিজ-এর রোগী দীর্ঘদিন হাইপারথাইরয়েডিজম-এ ভুগে পরে হাইপোথাইরয়েডিজম-এ ভুগতে পারেন।

নডিউলার গয়েটার-এ যাঁরা ভোগেন তাঁদের নডিউলের সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে—এক নডিউল-বিশিষ্ট (বা এক পিণ্ডবিশিষ্ট, solitary nodule) বা বহু নডিউল-বিশিষ্ট (বা বহু পিণ্ডবিশিষ্ট, multinodular) গলগণ্ড (goiter) বলা হয় তাদের। একটা নডিউলে থাইরয়েডের আকার বড়ো নাও হতে পারে। নডিউল থেকে যদি অতিরিক্ত হরমোন ক্ষরণ হয় তবে এ সব ক্ষেত্রে হাইপারথাইরয়েডিজম-এর উপসর্গ ও লক্ষণ দেখা যায়।

আর যে যে কারণে হাইপারথাইরয়েডিজম আর থাইরোটক্সিকোসিস হয় সেগুলো হল—

- অতিরিক্ত পরিমাণে আয়োডিন খাওয়া
- থাইরয়েড গ্রন্থির প্রদাহ (thyroiditis)
- থাইরয়েডের বিশেষ কিছু ক্যানসার
- শরীরের অন্য কোথাও থাইরয়েড হরমোন তৈরি হওয়া, যেমন—ফুসফুস বা ডিম্বাশয় (ovary)-এর টিউমার হলে তার অস্বাভাবিক কোষগুলো থেকে T_3 ও T_4 তৈরি হতে পারে।
- পিটুইটারি গ্রন্থির যে কোষগুলো TSH তৈরি করে, সেই কোষগুলোর টিউমার।

তবে এই সব কারণ তুলনায় বিরল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রেভস' ডিজিজ আর নডিউলার গয়েটারের জন্যই হাইপারথাইরয়েডিজম আর থাইরোটক্সি-কোসিস হয়ে থাকে।

এবার জেনে নেওয়া যাক কী কী উপসর্গ থাকলে হাইপারথাইরয়েডিজম সন্দেহ করব আর চিকিৎসার মূল ব্যাপারগুলো কী।

থাইরোটক্সিকোসিস-এর উপসর্গ

উপসর্গ বা symptom মানে রোগী যে সমস্যাগুলোর কথা বলেন।

- চঞ্চলতা (hyperactivity), খিটখিটে ভাব (irritability), অস্থিরতা (dysphoria)
- গরম সহ্য করতে না পারা, ঘামতে থাকা
- বুক ধড়ফড় করা
- অবসাদ ও দুর্বলতা
- খিদে বেশি থাকা সত্ত্বেও ওজন কমতে থাকা
- ডায়রিয়া
- বহুমূত্র
- রজঃস্বল্পতা, কামেচ্ছা কমে যাওয়া

থাইরোটক্সিকোসিস-এর লক্ষণ

লক্ষণ বা sign মানে ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করে যা যা পান।

- হৃদ্‌দ্রুতি (tachycardia, অর্থাৎ নাড়ীর গতি বেড়ে যাওয়া), বয়স্কদের অলিন্দের হৃদ্‌পেশির অনিয়মিত কম্পন (atrial fibrillation)
- হাত পা কাঁপা (কম্পন, tremor)
- গলগণ্ড অর্থাৎ থাইরয়েডের স্ফীতি
- গায়ের চামড়া গরম, ভেজা-ভেজা

- কমজোর মাংসপেশি, বিশেষ করে কাঁধ, ওপর-হাত, নিতম্ব ও থাইয়ের পেশি কমজোর হয়ে যাওয়া (নিকটস্থ পেশি-বিকার, proximal myopathy)
- চোখের ডিম বড়ো বড়ো, যেন চোখ সামনে এগিয়ে এসেছে (lid retraction বা lag)। (চিত্র ১)।
- ছেলেদের স্তনের আকার বেড়ে যাওয়া (পুংস্তনবৃদ্ধি বা gynaecomastia)

ল্যাবরেটরি পরীক্ষা

রক্তে T_3 T_4 ও TSH মেপে রোগ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। T_3, T_4 বেশি থাকবে ও TSH কম থাকবে। থাইরয়েড হরমোন এতটাই বেশি থাকে যে থাইরয়েড গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করার TSH (থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন)-এর আর দরকার পড়ে না। রোগ-নির্ণয়ের জন্য Free T_4 এবং TSH পরীক্ষা করাই শ্রেয়।

T_3, T_4 ও TSH কী?

T_3, T_4 ও TSH রক্তে থাকা তিনটে হরমোন। TSH (থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন) বেরোয় মাথার মধ্যে থাকা পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে। এর কাজ হল থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ। যদি থাইরয়েড কম কাজ করে তা হলে রক্তে T_3 ও T_4-এর মাত্রা কমে যায়। তখন TSH হরমোন বেশি বেরোয়, আর সেই TSH থাইরয়েড গ্রন্থিকে দিয়ে বেশি T_3 ও T_4 হরমোন তৈরি করিয়ে নেয়। উলটোদিকে, থাইরয়েড বেশি কাজ করলে রক্তে T_3 ও T_4-এর মাত্রা বেড়ে যায়। তখন TSH হরমোন কম বেরোয়, আর তার ফলে থাইরয়েড গ্রন্থির বেশি T_3 ও T_4 তৈরির প্রবণতা কিছুটা অন্তত কমে।

আর T_3 ও T_4-হরমোন—এদের কাজ হল শরীরের নানা কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করা। এরা কমলে শরীরে হাইপোথাইরয়েড রোগ হয়, এরা বাড়লে শরীরে হয় হাইপারথাইরয়েডিজম আর থাইরোটক্সিকোসিস।

রোগের জটিলতা

কোনো কারণে থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে খুব বেশি পরিমাণে হরমোন বেরোলে রোগীর শরীরের তাপমাত্রা মারাত্মকভাবে বাড়তে পারে, হৃৎপিণ্ডের কাজের অস্বাভাবিকতায় রক্তচাপ কমে যেতে পারে, হার্ট বিকল হয়ে যেতে পারে (heart failure), মস্তিষ্কের ওপর এর প্রভাবে রোগী অচেতন হয়ে যেতে পারেন। দ্রুত এই অবস্থার চিকিৎসা না হলে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। এই অবস্থাকে বলে থাইরয়েড সংকট (thyroid crisis) বা থাইরয়েড ঝড় (thyroid storm)।

চিত্র ২. থাইরয়েড অপারেশন

এ ছাড়াও অতিরিক্ত থাইরয়েড হরমোনের জন্য আরও অনেক সমস্যা হতে পারে। আগেই হার্টের দ্রুতগতির কথা বলা হয়েছে, তা ছাড়া রক্ত চলাচল হয়ে ওঠে দ্রুত ও পরিমাণে বেশি। অতিরিক্ত কাজ করার জন্য হার্টের মাংসপেশিতে অতিরিক্ত অক্সিজেনের দরকার পড়ে। যথেষ্ট অক্সিজেনের অভাবে হার্টের ব্যথা (angina) হতে পারে। হার্টের ছন্দের গণ্ডগোল হতে পারে—সাধারণ এক্টোপিক বিট (ectopic beat) থেকে শুরু করে অলিন্দের হৃদ্‌পেশির অনিয়মিত কম্পন (atrial fibrillation)-এর মতো জীবন সংশয়কারী অবস্থা অবধি। হার্ট দরকার মতো কাজ না করতে পারার জন্য হার্টের বিকলতা (heart failure) হতে পারে।

হাইপারথাইরয়েডিজম-এর চিকিৎসা

১. থাইরয়েড-নিরোধী ওষুধ (anti-thyroid drugs) কারবিমাজোল (carbimazole) থাইরয়েড হরমোন তৈরি কমিয়ে দেয়, ২ থেকে ৪ সপ্তাহ সময় লাগে ফল পেতে। ব্যবহার করা যায় থায়োইউরাসিল (thiouracil) ধরনের ওষুধও।

২. থাইরয়েড হরমোন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বিপাকজনিত কাজকে ত্বরান্বিত করে। প্রোপ্রানোলল (propranolol)-এর মতো বিটা-ব্লকারগুলো এই অতিরিক্ত কাজগুলোকে কমিয়ে দেয়। এই সব ওষুধে ফল যদিও খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়, তবে এর ফলে আসল সমস্যার সমাধান হয় না।

৩. রেডিও-আয়োডিন I^{131} থাইরয়েড গ্রন্থির কোষ-বিভাজনকে রোধ করে, কিছু কোষকে ধ্বংস করে হরমোন তৈরির ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। কিন্তু জননকোষের ওপর রেডিও-আয়োডিনের ক্ষতিকর প্রভাব আছে, তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ক্ষতি হতে পারে। তাই ভবিষ্যতে ছেলেমেয়ের জন্ম দিতে সক্ষম ও ইচ্ছুক এমন রোগীর এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা না করাই বাঞ্ছনীয়।

৪. অনেক সময় অতিরিক্ত ক্রিয়াশীল থাইরয়েড গ্রন্থির বেশিরভাগ অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়। এই অপারেশনে প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি বাদ পড়ে বলে রোগীকে সারাজীবন ক্যালশিয়াম দিতে হয়। অপারেশনের সময় স্বরযন্ত্রের স্নায়ু recurrent laryngeal nerve আঘাতগ্রস্ত হলে রোগী স্বর হারান। কোনো কারণে থাইরয়েড গ্রন্থি পুরোটা বাদ দিতে হলে রোগীকে সারাজীবন থাইরক্সিন খাইয়ে যেতে হয়। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য পরিচালিত দু-টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত।

ডাক্তারের মোহভঙ্গে ক্ষতিটা সবার

ডা. গৌতম মিস্ত্রী

চাষার ছেলে চাষা, মেথরের ছেলে মেথর আর ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হবে না তো কী হবে? অবশ্য বড়োলোকের বড়ো বংশের ছেলেদের কথা আলাদা; তারা ডাক্তার হতে চাইলে ডাক্তারি পেশার বাপের ভাগ্যি বলে ধরতে হবে। তারা উকিল-ব্যারিস্টার-আইএএস-আইপিএস-এমপি-এমএলএ সব হতে পারে, হতে পারে কোটিপতি ব্যবসায়ী-জমিদার, চাই কি কবি বা নাট্যকার। এতকাল ধরে শ্রেণিবিভক্ত সমাজ এই পরম্পরায় কালযাপন করেই সুখে শান্তিতে বসবাস করে আসছিল। পাছে লোকে কিছু বলে, তাই অবশ্য চাষাভুসো-জেলে-নাপিত-মেথর-চামার-কামার-পাহাড়ি-বুনোদের জন্য তালিকা বানিয়ে আম্বেদকরের হাতে খানিক আর মণ্ডল-কমিশনের হাতে খানিক দরজা-ফাঁক হয়েছে, কিন্তু সে-দরজা দিয়ে একবার মেডিক্যাল কলেজে ঢুকলে ডিগ্রি লাভের সঙ্গে নাসিকাকুঞ্চন ফাউ পাবার ব্যবস্থাও করে রাখা আছে। কিন্তু কী মুশকিল, তাই বলে তাদের তাগদ বেড়ে নিজের জোরে দরজা ঠেলে ঢুকবে না কি রে বাবা! বিশ্বায়নের 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' বলে ডুকরে উঠেছি মানে তো আর সত্যি সত্যিই সমান মাঠে আমরা আর পরাণ মণ্ডলের ছেঁড়া-গামছা-পরা ছেলেটার সঙ্গে খেলতে পারি না! স্টেট বোর্ডে বাংলায় পড়া ছেলেমেয়েদের উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সাধ খানিকটা ঠেকানো গেছে জয়েন্ট পরীক্ষায় সিবিএসই সিলেবাস সর্বত্র চালু করে, আর 'আমাদের' জন্য একটা এক্সক্লুসিভ ডাক্তারির ব্যবস্থা থাকবে না, এটা ভাবলেই গা রি-রি করে!

তবু উন্মুক্ত দুনিয়া চাষার আর মেথরের ছেলেমেয়েদের ডাক্তার হবার দরজাটা একটু ফাঁক করে দিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে ইদানীংকালে। সেই লড়াইয়ের দৌড় শুরুর বাঁশি যদিও এক সময়ে বাজে না, দৌড় শুরুর প্রস্তুতিপর্বে একই রসদ থাকে না, আরম্ভরেখাও এক লাইনে থাকে না। মেধা বাছাইয়ের মাপজোক নিয়ে মান-অভিমান, দাঙ্গা আর বিতর্ক চলছে। আমরা না চাইলেও চলতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। প্রতিযোগিতা থাকবে আর তার অবাঞ্ছিত অনুষঙ্গ থাকবে না এমন রামরাজ্য মহান কাব্যেই হয়। ভুল বলে ফেললাম। রাম-রাবণের প্রতিযোগিতা নিয়ম মতে হলে রামকে ঘরে ফিরতে হত না। কালেভদ্রে দৌড়বাজ চাষার আর মেথরের ছেলেরা ডাক্তারদের ছেলের সমানে সমানে, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দৌড়ানো শুরু করা দেখে ডাক্তারের বাচ্চাদের অন্য সব 'ভদ্রসভ্য' ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলার মতো আলাদা মাঠ বানিয়ে ফেলে প্রতিযোগিতাকে লাগাম পড়িয়ে তবেই না নিশ্চিন্ত। নিষিদ্ধ সমতার বদ-হাওয়া বর্জিত সেই মাঠে তেল মাখতে হলে বিস্তর কড়ি ফেলতে হয়। পোশাকি নাম ক্যাপিটেশন ফি, কোর্টের নানা হুজ্জুত এড়াতে সেটা টেবিলের তলা-ওপর সবখান দিয়ে ভাগ করে নেবার সুবিধেজনক ব্যবস্থাও চালু আছে। ডাক্তারের ছেলেদের ডাক্তার হওয়া আর ঠেকায় কে? আরে বাবা, এতে এত হইচই করার কী আছে? জাত ব্যাবসার গুণের গুণ গাও। নিজের গ্যাঁটের কড়ি খসিয়ে তোমাদের সেবায় গলায় স্টেথো পেন্ডুলামের মতো দোলাচ্ছি। ভয় পেও না, ভয় পেও না/তোমায় আমি মারব না/আমি আছি বাবা আছে/আছে আমার সব ছেলে/সবাই মিলে সুঁচ ফোটাব মিথ্যে অমন ভয় পেলে।

মহাকাল আকাশের মেঘের ফাঁক দিয়ে হাসছে। নাপিত ডাক্তার আজ কর্পোরেট ডাক্তার। অর্থনীতির ঝোড়ো হাওয়া সয়ে এতকাল ডাক্তার তার জয়ধ্বজা খাড়া রেখেছে। এবার বুঝি-বা রথের চাকা ব্যাক গিয়ারে। ডাক্তারের মুখ থেকে ভগবানের মুখোশটা খসে পড়েছে। কর্পোরেট প্রভুর বন্দুকটা, যেটা দিয়ে সে শিকার করে, সেটা যে ডাক্তারের ঘাড়ে। সেটা কিছু ডাক্তার বুঝেও আপোশ করে নিয়েছে। কেউ-বা ডাক্তারি ছেড়ে সওদাগরই বনে গেছে, নামের আগে খেতাবটা টুনি বালবের মতো মিটমিট করে জ্বলছে। ওই খেতাবটা কি তাকে কামড়ায়? রাত বারোটায় যখন সে আয়নার সামনে দাঁড়ায়, সাড়ে চার বছরের মেটিরিয়া মেডিকার প্রেমকাব্য কি তাকে তখন ক্ষতবিক্ষত করে? আয়নার সামনে দাঁড়াতে ভয় পাওয়া ডাক্তার অথবা আপোশ মানিয়ে নেওয়া ডাক্তার আয়নাকে এড়িয়ে চললেও এই রেকারিং ভাবনাগুলো সেরিব্রাল কর্টেক্সের প্রত্যন্ত প্রদেশে জমা হতে থাকে। প্রথার বিরুদ্ধে যেতে সে শেখেনি। স্বপ্নের জগতে যাত্রা করার ছন্দ তার অজানা। তার স্বপ্নের রূপ তার পরবর্তী প্রজন্মে দরকচা মার্কা দুঃস্বপ্নে পরিণত হতে দেখে সে কামড়ায় নিজের আঙুল। এইরকম ছন্দপতনের, স্বপ্নভঙ্গের সোপান পেরিয়ে কোনো কোনো তরুণ, বা হয়তো তারুণ্য-পেরোনো মধ্যবয়সি, বিদ্রোহ করে প্রকৃতির নিয়ম মেনে। কেননা গড্ডলিকা প্রবাহের মধ্যেও, প্রকৃতির নিয়ম মেনেই, কারও কারও ওই গড্ডলিকা প্রবাহেই বিস্তর অ্যালার্জি থাকবেই।

যখন স্কুল থেকে বেরিয়ে কলেজে ভর্তি হবার সময় আসে, সেই সন্ধিক্ষণটা ছাত্রছাত্রীর কাছে আর তাদের বাবা-মার কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। আর একটা প্রজন্মের সারাজীবনের ভবিষ্যতের ভিতটা শক্তপোক্ত করে নেবার মুহূর্ত। ছেলে মেয়েকে ইঞ্জিনিয়ার অথবা ডাক্তার করার ইঁদুর দৌড়ের বিপরীতে একটা ক্ষীণ স্রোত বওয়া শুরু হয়েছে দেশে ও বিদেশে। খুব অল্প হলেও, কখনো-কখনো আবার এটাও দেখা যায়, একজন ডাক্তার তার কর্মজীবনের মধ্যগগনে হঠাৎ স্ব-ইচ্ছায় কাজের বোঝা কমিয়ে দিয়ে কম ঝুঁকির কাজ খুঁজে নেয়। মেধা বা ক্ষমতা থাকলেও চিকিৎসার প্রিয় শাখা ছেড়ে কম চাপের প্যারাক্লিনিক্যাল (প্যাথলজি, অ্যানাটমি ইত্যাদি) ও এমারজেন্সি নেই এমন শাখা (ডারমাটোলজি, ইএনটি ইত্যাদি) বেছে নেয়। এ সবই পেশা হিসাবে ডাক্তারিতে অপছন্দের আভাস, অ্যালার্জির প্রাথমিক লক্ষণ।

তিন-চার দশক আগে পর্যন্তও ডাক্তারি পেশাটা নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মেধাবী ছেলেমেয়েদের পরিবারের আর্থসামাজিক উন্নয়নের সহজ উপায় ছিল। ব্যক্তিগত স্বার্থলাভ হত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের অধিকাংশই শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতি পুরো মুছে ফেলতে পারত না। সামাজিক দায়বদ্ধতা রক্তে বহমান থেকে যেত ক্ষীণধারায়। এদের পেশা নির্বাচনটা সুপরিকল্পিত, এককাট্টা ও দীর্ঘ ঘষামাজার অন্তিম প্রাপ্তি হতে পারত, আবার নাও হতে

পারত; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ডাক্তারিটা মন দিয়ে করত। মানসিক অবসাদ এদের গ্রাস করত না। চিকিৎসা প্রযুক্তির কোনো একটা শাখার নীচের ডালে বাসা বেঁধে সুখে শান্তিতে ঘরকন্না করত। গাছের ডালের ডগার দিকে পৌঁছোতে না পারার জন্য, দিস্তে দিস্তে চর্বিতচর্বণ মার্কা, যৎসামান্য এধার-ওধার করে নকল করা গবেষণা প্রবন্ধ লিখতে না পারার জন্য, অথবা ঠাটবাটে নিজের সতীর্থকে প্রতিযোগিতায় হারাতে না পারার জন্য তাদের আক্ষেপ ছিল না। এদের দিয়ে সমাজের চারপাশের রহিম শেখ ও নিমাই দাসদের খানিক উপকার হত, অন্তত তাদের টাকার থলে হিসেবে না দেখে মানুষ বলে দেখার চোখটা এদের পেশার চাপে পড়ে হারিয়ে যেত না।

চিকিৎসা পরিষেবার বাণিজ্যায়নের হাত ধরে ফি বছর নতুন নতুন উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তি তার পসরা মেলে ধরল। সেই প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মেলানোর চ্যালেঞ্জের চেয়ে সেটা প্রয়োগের আর্থিক বাধা বেশি ভারী হয়ে পড়ল স্বাধীন ডাক্তারদের কাছে। স্বাধীনচেতা আর মানবিকতার ভগ্নাংশ টিকে থাকা ডাক্তাররা এখনও বিষমভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মূলত সেইসব প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে যেখানে সরকারি পরিষেবা কেবল দরজা-জানালাহীন পুরাতাত্ত্বিক স্থাপত্যকীর্তি মাত্র আর কর্পোরেট চিকিৎসা নেই। চিকিৎসার বাণিজ্যায়নে এই ডাক্তারদের অস্তিত্বের সংকট অবশ্যম্ভাবী হয়ে চলেছে। শহরের কথা ছেড়ে দিলেও, সুদূর গ্রামেগঞ্জে পৌঁছে যাচ্ছে কর্পোরেট হাসপাতালের থাবা। ডাক্তারদের টিকে থাকার জন্য কোনো এক কর্পোরেটের ছাতার ছায়ায় আশ্রয় নিতেই হচ্ছে এবার। নতুন পোশাকে সজ্জিত পাড়ার ডাক্তারের আর একবার উত্তরণ হচ্ছে ঠিক যেমন করে শতাব্দী আগে নাপিত পাড়ার এমবিবিএস, জিপি হয়েছিল। বা আরও সত্যি হবে যদি বলা যায় যে সে সেদিন স্পেশালিস্ট হয়ে উঠতে পারেনি, গরিবের খানিক ভরসা হলেও ডাক্তারি সামাজিক-আর্থিক মইতে চলে গেছিল নীচের ধাপে। আর তারই জেরে সমাজে সে ক্রমশ কৃপার পাত্র হয়ে ওঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল, কিন্তু তার কানের কাছে পোষা তোতাপাখির মতো পুরোনো বুলি 'ডাক্তারবাবু ভগবান, আমাকে বাঁচিয়েছেন' ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল বলে সে এক আজব পরাবাস্তবতার দন কিহোতের রোলে অভিনয় করে যাচ্ছিল নিজের কাছেই। এক প্রবীণ জেনারেল ফিজিশিয়ান আক্ষেপ করে বলেছিলেন, খুব শিগগিরই সব রোগের চিকিৎসায় সড়গড় ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান বা পারিবারিক ডাক্তার এক লুপ্তপ্রায় প্রজাতিতে পরিণত হবে। হবে কেন, হয়েছে বললেই সত্যের বেশি কাছাকাছি হয়। তবে কেন হচ্ছে, সে প্রশ্নের জবাব মেলা ভার।

বা জবাবটা ডাক্তারের কাছে নেই। আছে আর পাঁচজনের কাছে। যে পাঁচজন মধ্যবিত্তের উচ্চবিত্ত-স্বপ্নকে খণ্ড খণ্ড করে দেখলে দেখা যাবে, গাড়ি-বাড়ি-বিদেশ ভ্রমণের পাশাপাশি বড়ো ইংরেজি স্কুলে ঢোকানো আর বড়ো ডাক্তার দেখানোর উচ্চাশা একসঙ্গে আছে। বড়ো ডাক্তারের সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলা যায় না বটে, আর তাঁদের দরকারের সময় পাওয়া যায় না, সেও সত্যি, কিন্তু লোককে বলা যায়। বলা যায় ভেলোরে গেছিলুম, অ্যাপেলোতে গেছিলুম, টাটা-ক্যান্সারে গেছিলুম। পাঁচতারা হাসপাতালের মানেই পাঁচতারা ডাক্তার—হুঁ হুঁ বাবা, মরি মরব, কিন্তু এলিতেলির মতো মরব না। একবারই তো মরবেন, কেতায় মরুন। পাড়ার গোবিন্দ ডাক্তারের হাতে কিংবা সরকারি হাসপাতালের জিপি মায় স্পেশালিস্টের হাতে মরে বাড়ির সবার লজ্জায় মাথা কাটা যাবার বেফায়দা রিস্ক নেবেন না। যারা পয়সা দিতে পারবেন না, তারা গোবিন্দ-ডাক্তার কি সরকারি ডাক্তারের কাছে যাবে বটে, কিন্তু বাস-ট্রেন-ক্লাবঘর-পাড়ার-রক প্রভৃতি আধুনিক চণ্ডীমণ্ডপে হয় লজ্জায় আধোমুখে থাকবে, নয়তো কীভাবে নেহাত বাধ্য হয়ে মাকে বা বাবাকে নিয়ে পাড়ার চেম্বারে বা সরকারি হরিঘোষের গোয়ালে গোবিন্দ-শরণ করেছিলেন, সেকথা বলবেন; আর বলবেন, নাঃ, এরা ডাক্তার নয়, ডাকাত। পাঁচতারা অন্যরা কৃপাভরে দেখবেন, যদিও তাঁরা জানেন কাচের দরজার ওপারে তাঁদের বাবা-মাকে ঢুকিয়ে নেবার পরে তাঁদের একমাত্র কাজ ছিল বিল মেটানো, আর মাঝে-মধ্যে ডাক্তারবাবু যা বলেন তা শুনে যাওয়া। কেমন চিকিৎসা হয়েছে সেটা তাঁরা বোঝেননি, বোঝানোর সময় বা ইচ্ছে ছিল না সেইসব বড়ো ভগবানদের, তবে হ্যাঁ, এসি চলছিল বাইরে-ভেতরে চব্বিশ ঘণ্টা। ফলে সরকারি হাসপাতালের রোগীর চাইতে 'স্ট্যাটাস' আলাদা, সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

সে যাকগে, আপাতত ডাক্তারের ডাক্তার হয়ে ওঠার কথায় ফিরি। মেধাবাজির জোরে হোক অথবা টাকার জোরে হোক, ডাক্তার বাবাজি মেডিক্যাল কলেজের সুদীর্ঘ সোপান পেরিয়ে মাথায় কাঁটার মুকুটটি চাপিয়ে বাজারে যখন বেরোল তখন তার মাথার চারদিকে একটা গনগনে হ্যালো, বিশাল এক রাশভারী ঠুনকো চালচিত্র। পকেটে ফুটো কড়ি নেই, কিন্তু বাসেট্রামে চড়তে পারে না। বাপের টাকায় আর কতদিন চলে? এমনিতেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে বেশ দেরিই হয়ে গেছে। অন্য পেশার সতীর্থরা ঘর বসিয়ে ফেলেছে। বাপ-মায়ের সাধের স্বপ্ন, ডাক্তার ছেলে-মেয়ে এক ঝটকায় আর্থসামাজিক সোপানের সিঁড়িগুলো ডাবল প্রোমোশনের মোমেন্টামে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যাবে। সদ্য পাস করা জুনিয়র ডাক্তার তখন এমবিবিএস লেজের ক্ষুদ্রতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে এক দিকে লেজ টেনে লম্বা করার জন্য রোগী ছেড়ে বই আঁকড়ে ধরেছে যাতে কোনো একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশনের দরজা খোলে, অন্যদিকে যদি ঝাঁপ খুলে বসতেই হয় সেটা ভেবে ঐচ্ছিক স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণের পর্যায়টা বাদ দিয়ে ক্লাসরুম থেকে একেবারে স্টেজে। হাড়ে হাড়ে সে তখন বুঝছে মাথার চারধারের হ্যালো টাকায় পরিণত হয় না। রোগীর টাইফয়েড না ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া হয়েছে সেটা আলোচনা করে নেওয়ার জন্য চারপাশে কেউ নেই। মাঝমাঠে এক গ্যালারি উৎকণ্ঠিত ও সক্রিয় দর্শকের মাঝে সে একদম একা। ভুলচুক হলে দ্বিতীয় ইনিংসের সুযোগ নেই। বদনাম মানে কেবল পেশার মৃত্যুই নয়, গালিগালাজ, কিল চড়, রক্তারক্তি এখন জলভাত। মামলা মোকদ্দমা, ক্রেতা-সুরক্ষা আদালত, কাদা ছেটানো বিরূপ মিডিয়া ইত্যাদি আরও অনেক আছে। দিনান্তে কয়েকটা মশা মাছি মেরে আর ক্বচিৎ-কদাচিৎ কয়েকটা সাত ঘাটের জল খাওয়া দুরারোগ্য রোগীর অম্বলের সাতকাহনের সুদীর্ঘ ইতিহাস শুনে ডাক্তার ভ্রূ কুঁচকে দেখার চেষ্টা করল সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির পেট্রলের খরচটা উঠল কিনা। বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। রাতে আবার স্কুলের সহপাঠীর মেয়ের জন্মদিনের পার্টিতে যেতে হবে। মেয়েকে তার বন্ধু শহরের নামজাদা স্কুলে পড়ায়। এ আমন্ত্রণে বন্ধুত্বর চেয়ে বিজ্ঞাপনটাই মুখ্য। দু-একটা ডাক্তার থাকলে পার্টিটা বেশ কসমোপলিটান হয়, আবার খুচরো কাজেও লেগে যায়। রাতে শুতে যাবার আগে জুনিয়র ডাক্তার আয়নার সামনে সহপাঠীর সঙ্গে নিজের ছবিটা

মিলিয়ে দেখার সময় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। সুবিধার সঙ্গে অসুবিধা জড়িয়ে থাকে সব পেশাতেই, তবে মাথার চারপাশের ওই হ্যালোর ছবিটা ডাক্তারকে তার বাচ্চাবয়স থেকে সুবিধা-অসুবিধার হিসেবে বড্ড ভুল করিয়ে দেয়। ফোলানো ফানুসের অলীক বেলুনটা জুনিয়র ডাক্তারদের চোখের সামনে চুপসে যায় মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরোনোর পরেই। স্কুল থেকে সোজা মেডিক্যাল কলেজে ঢোকা। ভাইব্রেনট কৈশোরের ভাইব্রেশন হৃদয়ে পৌঁছোনোর সুযোগ পেল না। কৈশোরের সন্ধ্যায় যখন পাঠশালা থেকে মুক্তি মিলল তখন রাস্তার মোড়ে ফুচকা খাবার উপায় নেই, মেলার নাগরদোলায় চড়া শোভা পায় না। পকেটে টানাটানি থাকলেও বাসেট্রামে চড়া সম্ভব নয়। ইচ্ছে স্বাধীনতায় বলি দিয়ে শৈশব থেকে লম্বা লাফে কৈশোর আর তারুণ্যকে ডিঙিয়ে জীবনের মাঝখানে অবতরণ।

দু-চার দশক আগেও ডাক্তারি পেশার একটা ইয়ে ছিল। সাদাকালো সিনেমায় উত্তমকুমাররা যে ইমেজটা তৈরি করে দিয়ে গেছেন বাঙালি মননে তার কিছুটা বাস্তবতা ছিল। ডাক্তার মানে মাটির আধহাত ওপর দিয়ে চলা জীব, ঈশ্বর আর মানুষের মাঝামাঝি এক অতিমানব। সেই অতিমানবের মূর্তি আকছার মাটির মানুষের দড়ি টানাটানিতে খান খান হয়ে ভূলুণ্ঠিত হতে দেখা যাচ্ছে আজকাল। এর কারণ হিসেবে কেবল মাটির মানুষের সচেতনতাকে আর যুক্তি-বিজ্ঞান মনস্কতাকে দায়ী (!) করলে অসম্পূর্ণ মূল্যায়ন হয়ে যাবে। দুর্বার গতিতে চিকিৎসা প্রযুক্তি এখন বাণিজ্য ঘোড়ার সওয়ার। বিশ্বায়নের রাজসূয় যজ্ঞের সে ঘোড়া দারিদ্র্যসীমার বাঁধা না মেনে সবার আঙিনায় হাজির—রাস্তার মোড়ের বিজ্ঞাপনে বা টেলিভিশনের পর্দায় হৃদয়ের রক্তস্রোতের বাধাবিপত্তি নির্মূলের আর পেটের অন্দরের গলিঘুঁজিতে জমে ওঠা নুড়ি পাথরের 'ফ্লাশ-আউট' করে নেবার কথা শুনিয়ে যাচ্ছে অহর্নিশি। গৃহ চিকিৎসকের ভূমিকা ''হেঁ হেঁ হাসি মাখা মুখ করে থাকা'' নীরব দর্শকে পর্যবসিত। পেটের ও মানের দায়ে সে কর্পোরেটের ছাতার তলায় আশ্রয় নিলে তার মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে দায়ী করা যায় না। ডাক্তার নামক মহাপুরুষকে আর পাঁচজনের কল্পনার মহানুভবতার বোঝা বইতে হবে এটা আশা করা যায়, দাবি করা যায় না। উন্নত দুনিয়ার কারখানা থেকে নিত্যনতুন আরও অধিক কার্যকারী চমকপ্রদ চিকিৎসা পরিষেবার পসরার খুড়োর কল কর্পোরেট স্টার-মার্কা হাসপাতালগুলো নাকের ডগায় নাচাচ্ছে। ছোকরা ডাক্তার তার তেল চিটচিটে স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে এলাইট মধ্যবিত্তর মন কাড়তে পারছে না। হাঙররূপী কর্পোরেট চিকিৎসা ব্যবসায়ী আর শিকাররূপী মধ্যবিত্তর মাঝখানে ডাক্তার প্রজাতি ভগবান থেকে দালালে রূপান্তরিত হয়েছে। যার সেই রূপান্তরটা হয়নি, আর একবার কৈশোর থেকে জীবনের পথ চলা শুরু করার সুযোগ পেলে সে হয়তো প্রাণ খুলে গান গাইত, ছবি আঁকত। কবিতা লিখত। মাঝে মাঝে অসুস্থ রুগ্ন মানুষের দেখা পেলে পাশে বসে মাথায় হাত বোলাত। মার্সেডিস থেকে বড়ো বড়ো ডাক্তাররা রোগী দেখতে এলে তার ব্যাগ বইত।

অন্য অনেক পেশার জগতে চুল পাকলে ঘিলুও পাকে। সেই পাকা মাথার জোরে গতরটাকে কিছুটা রেহাই দেওয়া যায়। ডাক্তারদের সেই উপায়টাও নেই। যতই বুদ্ধি পাকুক না কেন, শারীরিক পরিশ্রম না করলে লবডঙ্কা। চাকরি-বাকরি না জোটাতে পারলে বাঘা বাঘা ডাক্তারও দিনমজুর। ফেরিওয়ালার ঝাঁকি নিয়ে না বেরোলে রোজগারপাতি বন্ধ। চাকরিওয়ালা ডাক্তারদের কাচ্চি ঘানি সরষের তেল পকেটে নিয়ে ঘুরতে হয়। সরকারি দপ্তরের দ্বাররক্ষকের শ্যালকের পিসশ্বশুরের পিঠ চুলকালে মোলায়েম করে তেল মালিশ না করতে পারলে সোঁদরবনে বদলি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই আদবকায়দাগুলো চৌদ্দ বছর ডাক্তারি বই পড়েও জানা যায় না, কারও কাছে শেখা যায় না। কী মুশকিল! বাঘগেড়িয়া নামে মেদিনীপুরের এমনই এক গণ্ডগ্রামে চাষের খেতের মধ্যে এক ফালি অনাবাদী জমির ওপর দরজা-জানালাবিহীন সরকারি হাসপাতাল। সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টার। বিগত শতকের একেবারে শেষে এক তরুণ ডাক্তার দেশের সেরা এক মেডিক্যাল কলেজ থেকে হৃদ্‌রোগে প্রশিক্ষিত হয়ে চাকরি করতে গিয়ে ওখানে পৌঁছেছিল। সেখানে রোগী কোথা থেকে আসবে? সবথেকে কাছের জনবসতি থেকে শেয়ারের ভ্যান রিক্সায় পনেরো মিনিট লাগে ওখানে পৌঁছুতে। ওষুধ থাকে দুই কিলোমিটার দূরের থানায়। হেলথ সেন্টারের কম্পাউন্ডার দৈনিক পাঁচ টাকার বিনিময়ে ওষুধের পসরা থানা-হাসপাতাল করেন। এই অর্থনৈতিক সিম্বায়োসিস কীভাবে সেটিং হল সেটা সেই তরুণ ডাক্তার জানতে পারেনি। মনে বড়ো ভুল স্বপ্ন। সরকারি মেডিক্যাল কলেজে নামমাত্র খরচে সদ্য শেখা অমূল্য প্রশিক্ষণের সদ্য ব্যবহার করার স্বপ্ন। মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনা আর শিক্ষকতা করে ঋণশোধের স্বপ্ন। তবুও সে গুছিয়ে নিয়েছিল, মানিয়ে নিয়েছিল সংকুচিত পরিধিটাকে। বছরখানেক পরে বড়ো সংকোচ করে তার হর্তাকর্তা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিককে নিবেদন করল, যদি ইন্ডোর, অর্থাৎ রোগী ভর্তি থাকার সুবিধে, আছে এমন কোনো মহকুমা হাসপাতালে কাজের সুযোগ পাওয়া যায়। তার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার শংসাপত্র দাখিল করার পরে উনি কিছুটা রাগত স্বরেই বললেন, কত ডিসিএইচ ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তোমারটা তো দু-অক্ষরের! অর্থাৎ এমডি-র পরে 'ডিএম' নামক সুপার-স্পেশালিটির ডিগ্রি। এর পরে আর আলোচনা চলে না। তরুণ ডাক্তার সেই যে চাবির গোছা ওনার টেবিলে রেখে এসেছে, তারপর তার আর ওমুখো হওয়ার রুচি হয়নি। লাল বাড়ির লাল ফিতে বগলে করণিক দেখলে এখন তার স্পেনের বুল-ফাইটের বুল হতে ইচ্ছে জাগে।

তবে কেবল মধ্যবিত্ত-মূল্যবোধ, বা গোটা সমাজের দেখার চোখই যে ডাক্তারদের বদলে দিল, তা নয়। আরও বিস্তর কারণ আছে। ডাক্তারি পাঠ্যক্রমে বিশাল গলদ আছে। বিগত শতাব্দীর পাঁচ বছরের পাঠ্যক্রম এখন সাড়ে চার বছরে কম্প্রেস করে শেয়াল পণ্ডিতরা পড়ুয়াদের মাথায় গজাল মেরে গোঁজার মেশিনারি বানিয়ে টাকা কামাচ্ছে। যদিও রোগভোগের বাড়বাড়ন্তে, আর কাজের না-হোক বিজ্ঞান-উন্নতির তত্ত্ব-কচকচিতে, অনেক বেশি পড়তে হচ্ছে। তার ওপরে আছে দৃষ্টিভঙ্গির বৈপরীত্য। বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থার অঙ্গুলিহেলনে যখন দেশের নীতি নির্ধারণ হচ্ছে, তখন তাদের মদতপুষ্ট ডাক্তারি শিক্ষাক্রমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্য কুমিরের কান্না বলেই প্রতিভাত হয়। আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম পাশ্চাত্য দেশের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে তৈরি। সে এক অন্য আলোচনা। শুধু একটা বিষয় উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ আজকের মতো মুলতুবি রাখব। আমাদের দেশে অ্যাক্যোয়াড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি ডিজিস বা এইডস-এ ক-টা লোক মারা যায়? এই ধরনের সংক্রামক রোগের প্রতিরোধের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ হয়ে যাচ্ছে। এইসব রোগ দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা

মানে না বলেই উন্নত দেশের মদতপুষ্ট বহুল-প্রচারিত আন্তর্জাতিক চিকিৎসা-অভিভাবক সংস্থাগুলোর এত মাথাব্যথা। অন্যদিকে পেটখারাপ, নিউমোনিয়া, টিবি, ম্যালেরিয়া, হৃদ্‌রোগ, সেরিব্রাল-স্ট্রোক বা ডায়াবেটিস—এই ধরনের রোগে আমাদের মাথাব্যথা বেশি হবার কথা ছিল। অথচ এইসব মারণরোগ প্রতিরোধে কার্যকারী কোনো রোগ প্রতিরোধের কর্মসূচি নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই, এবং পাবলিক ডেঙ্গু ছড়ালে খানিক কেঁইমেই করে বটে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যের কোনটা বেশি দরকার আর কোনটা ফ্যান্সি মাল, সে নিয়ে ধারণা করতে তেনাদের বড্ড খাটনি মালুম হয়।

আমার জানা নেই এই গৌরবান্বিত পেশার খেলোয়াড় হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য যে রগড়ানির মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষানবিশ ডাক্তারি ছাত্র-ছাত্রীকে যেতে হয় সেটা অন্য পেশার ক-জন জানেন। ডাক্তাররা আজীবন ''প্র্যাকটিস'' নামে যে কর্মকাণ্ডটি করে থাকেন, সেটা সদর্থেই হাত পাকানোর এক অন্তহীন প্রক্রিয়া। এই শেখার কোনো শেষ নেই। বই পড়া বন্ধ বা প্র্যাকটিস বন্ধ করলেই চিকিৎসকের অপমৃত্যু হয়, ডিগ্রিধারী হোয়াইট কোট পড়া স্টেথো ঝোলানো দেহটা টিঁকে থাকে মাত্র। কর্পোরেট ব্যবসায়ী চিকিৎসা হাঙরের কাছে ডাক্তার কেবল এক কর্মী, যাকে দিয়ে লাভের কড়ি ঘরে তোলা যাবে। একজন তরুণ চিকিৎসক অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি বৎসর ধরে মেডিক্যাল কলেজের হার্ডলগুলো শেষ করে সে দেখে তার সামনে একটিই রাস্তা খোলা আছে—সেটা আপোশের রাস্তা, আপোশের রাস্তায় হেঁটে কর্পোরেটের দামি পাপোশ বোনার রাস্তা। তাকে কর্পোরেটের ঝাঁকি বোঝাই করতে হবে। এর চেয়ে বড়ো কঠোর সত্য আর কিছু নেই।

একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার জেনে যায়, ঠেকে শিখে যায়, শত সহস্র অসফল বেঠিক সিদ্ধান্ত, ভুলভ্রান্তি আর রোগোপশম না হওয়া রোগীদের সঙ্গে থেকে, মনে মনে নিজের সঙ্গে, বই-জার্নালের সঙ্গে আর অন্য ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনা-তর্ক-যুদ্ধ করে তবেই ডাক্তারের বুদ্ধিটা পাকে। ভালো প্রশিক্ষণ অপরিহার্য, কিন্তু সেটা তার হাতে-খড়ি মাত্র। আসল শেখার শুরু কর্মজীবন শুরু করার পরে। মেডিক্যাল কলেজের সিঁড়িগুলোতে তেরো বছর হোঁচট খেয়ে খেয়ে আজ থেকে বাইশ বছর আগে যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করি তখনও প্রচুর অনুকরণ-যোগ্য প্রবাদপ্রতিম 'মাস্টার ক্লিনিশিয়ান' ছিলেন। শহরে ও গ্রামেগঞ্জে—সব জায়গায়ই তাঁরা ছিলেন। জেনারেল ফিজিশিয়ান তাঁরা, তবে প্রকৃত অর্থেই 'জেনারেল' পদ-মর্যাদার ডাক্তার। ক্লিনিক্যাল যোগ্যতা দিয়েই তাঁদের প্রায় সব রোগের চিকিৎসা করতে হত, কথায় কথায় গাদা গাদা পরীক্ষা করা বা ধাঁ করে এখানে ওখানে রেফার করার বদ অভ্যেস তাদের ছিল না। এই বিরল প্রজাতির চিকিৎসকরা আজ আর তৈরি হন না। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে দেখুন, এঁরা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছেন। না হবার কারণও নেই। সেদিন আমার কাছে এক ভদ্রলোক এসে বললেন, ডেঙ্গু হয়েছে দেখেই সিজিএস স্কিমের যে জেনারেল ফিজিশিয়ান তাঁর স্ত্রীকে দেখেন, তিনি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে ভর্তি করার সুপারিশ লিখে দিয়েছেন—কি অন্যায় রকম দায় খালাস হবার ডাক্তারি! জিজ্ঞেস করলাম, এর আগে সিজিএস-এর যে ডাক্তার দেখতেন, তিনি কী করতেন? ভদ্রলোক বললেন, তিনি খুব যত্ন করে দেখতেন, আর 'বড়ো' ডাক্তারেরা যে প্রেসক্রিপশন করে দিতেন সেগুলো বিনা বাক্যব্যয়ে লিখে দিতেন, অর্থাৎ সেইসব ওষুধ গর্ভমেন্টের পয়সায় পাবার ব্যবস্থা করতেন। বুঝলাম, এঁরা সব গাছেরও খাবেন, তলারও কুড়োবেন। আশা করবেন জিপি ভালো করে দেখবেন, আর তারপর নিজের দেখার ওপর আস্থা না-রেখে 'বড়ো' ডাক্তার ভগবানের পাদপদ্মে শ্রীচরণে-শু হয়ে গলে যাবেন! আত্মসম্মান না-থাকা ডাক্তারের কাছে যে কিছুতেই ভালো চিকিৎসা পাওয়া যায় না, সেটা এঁরা-ওঁরা-তাঁরা কেউই বুঝবেন না, কিন্তু ডাক্তারকে বলির পাঁঠা বানাবেন ইচ্ছেমাফিক।

এখন মাইক্রো-ম্যানেজের যুগ—কেবল এক-একটা রোগের চিকিৎসা। রোগীর চিকিৎসা বড়ো একটা হয় না। রোগীর বাড়ির ও হাঁড়ির হাল হকিকত না জেনে মাস-প্রোডাকশনের মডেলে এক বেলায় এক-দেড়-শো রোগী কেমন করে পরিষেবা পায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের বহির্বিভাগে সেটা ভেবে পাই না। এসব দেখে বিবেক-না খোয়ানো তরুণ ও বিদগ্ধ হাতেগোনা কয়েকটি চিকিৎসক যদি হতাশাগ্রস্ত হয়ে গায়ে মাথায় ধুলো মেখে ডাংগুলি খেলতে না নামে তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আত্মহত্যাই করে বসবে। আমার চেনা এমনই এক নবীন ডাক্তারের গলায় স্টেথোর জায়গায় এখন ক্যামেরা ঝোলে। সে আর ডাক্তারি করে না। ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে বাবা ডাক্তারি না পড়িয়ে ভালো ক্যামেরা কিনে দিলে সে বেশি খুশি হত।

সবাই নিজ নিজ মেধা, রুচি ও ক্ষমতা অনুযায়ী ডাক্তারি পেশার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা বেছে নেবে। মানসিকতার ছন্দে মেলে না বলে অনেকেই এমারজেন্সি নেই এমন শাখা বেছে নিতে চাইবে। কেউ বা বেছে নেবে প্রশাসন অথবা গবেষণা। সমস্যা হল, রাতে-বিরেতে সময়ে-অসময়ে আপতকালীন চিকিৎসার ঠেকা দিতে পারা ডাক্তাররা হারিয়ে যাচ্ছে। গুরুতর সমস্যায় আই-সি-সি-ইউ-র বদ্ধ কুঠুরির অন্তরালে যখন যমে-মানুষে টানাটানি হচ্ছে সেখানে আবছা আলোয় ব্যাটিং করছেন অনভিজ্ঞ শিক্ষানবিশ মেডিক্যাল অফিসার। অভিজ্ঞ প্রবীণ ডাক্তারের কাছে রোগীর আকুতির তরঙ্গ পৌঁছোয় না। যেখানে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতার দরকার, সেখানে এমবিবিএস শেষ করে স্পেশালিস্ট ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাবার মাঝখানে থাকা, খেপ খাটা, মনখানা অন্যখানে বাঁধা, বই মুখে আড়চোখে চাওয়া এক অনভিজ্ঞ পড়ুয়ার ডাক্তারের হাতে যমে-মানুষে টানাটানি খেলার দড়ি। কু-জনেরা বলে, এরাও আজকাল আক্রা। হাসপাতাল ব্যবসায়ীর কাছে হোমিওপ্যাথি আর অলটারনেটিভ মেডিসিনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসাররা কিছুটা কম খরচের।

বিদেশের হাওয়া এখন আমাদের দেশেও বইছে। স্ব-ইচ্ছা প্রকাশক্ষম অনেক মেধাবী কিশোর-কিশোরী ডাক্তার হতে চাইছে না। বিশ্বায়নের খোলা জানালা দিয়ে বাণিজ্যিক চিকিৎসার বদ হাওয়া ঢুকে অনেক তরুণ তরুণীর মনে ডাক্তারি নামক পেশার এলাইট ঢেউ তুলতে পারছে না। আগামী দিনের নাগরিকদের এক বড়ো দুঃসময় আসছে। যন্ত্রের হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যার দিয়ে মঙ্গলে যান হয়তো পৌঁছে দেওয়া যায়, অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা হয় কি? প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তারের বৈদগ্ধ ধীরে ধীরে আসে। সঠিক রোগনির্ণয়ের জন্য রোগীকে সময় দিতে হয় সমস্যাকে পাখির চোখ করে। আজকাল আবার এক বাতুলতার চল হয়েছে—দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া, shared decision, এক একটা অঙ্গের দায়িত্ব এক-এক বাঘা-বাঘা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের উপর ন্যস্ত। একজন ডাক্তার হার্টের পাম্পের

কাজটা দেখছে তো আর একজন ডাক্তার তার কিডনি সুরক্ষার দায়িত্বে আছেন। পুরোটা কেউই দেখছেন না। ভাগের মা গঙ্গা না পাওয়ার মতো অবস্থা। রোগীর সামগ্রিক দায়িত্বে কেউ নেই। রোগীর মানসিক অসুস্থতা অবহেলিত। স্মার্টফোন আর কম্পিউটার জ্বরের কারণ নির্ণয় করে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারে না। উন্নত মানের ইসিজি মেশিন বুক ধড়ফড়ের কারণ নিশ্চিত করতে পারে না। গোমড়ামুখো হতাশাগ্রস্ত চিকিৎসক-সমাজ ক্রমশ প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে মানবিকতার যুগলবন্দি না হলে সুচিকিৎসা হয় না। আজকাল মরণাপন্ন রোগীর শিয়রে বসে কান্না চেপে দু-দণ্ড ছদ্ম-রসিকতায় মজে না কোনো ডাক্তার। এমন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এখন কোথায় পাবেন, যে অনিরাময়যোগ্য ক্যান্সারের রোগীকে তার জীবনের শেষ কয়েকটা মাসে অকাজের অমানবিক শাস্তি-স্বরূপ কেমোথেরাপি থেকে রক্ষা করে পরিবারের প্রিয়জনের সঙ্গে বাঁচতে দেবে?

আমাকে প্রায়ই রোগীরা বলেন, কোনো নতুন ভালো জেনারেল ফিজিশিয়ানের সন্ধান দিতে। এমন কেউ, যে অন্তত রোগীর কষ্টের কথা মন দিয়ে শুনবেন। ভালো জেনারেল ফিজিশিয়ান তো দূরের কথা, জেনারেল ফিজিশিয়ানের ভূমিকায় কোনো নবীন ডাক্তারই অবতীর্ণ হতে চায় না। বড়ো খাটুনির ভূমিকা সেই অবতারের, বড়ো অনিশ্চয়তা সেই পথে। এর চেয়ে তারা রক্তবীজের মতো জন্ম নেওয়া অসংখ্য বেসরকারি হাসপাতালে খেপ খাটার চাকরিতে আপোশ করে নিচ্ছে। তাদেরও তো সাধ আহ্লাদ আছে।

আমার ভয়, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নীতিনির্ধারণের ভার যাদের ওপরে তারা এক ঐতিহাসিক ভুল করতে চলেছে। এঁরা স্বাস্থ্য পরিষেবার রোগ-লক্ষণের চিকিৎসা করছেন, ভুল করে বা ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য মূল কারণ এড়িয়ে যাচ্ছেন। যেকোনো শিক্ষার মতো, যদি আমরা সুচিকিৎসা চাই, রোগের মানবিক দিকগুলোকে মূল্য দিতে হবে। বড়ো ডিগ্রিধারী কর্পোরেট চিকিৎসা ব্যবসায়ীর স্বার্থরক্ষাকারী ‘‘টানেল ভিশন’’ ওয়ালা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নয়, প্রয়োজনে মানবিকতাসম্পন্ন উপভোক্তামুখী সব বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানওয়ালা জেনারেল ফিজিশিয়ান। আমাদের দেশে চিকিৎসা পরিষেবা কবে কনজিউমারিজম-এর কবজা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রকৃত মৌলিক অধিকারে পরিণত হয়ে অনেক দেশের মতো ‘‘ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ারে’’ পর্যবসিত হবে জানা নেই। যতদিন সেটা না হচ্ছে, নবীন ডাক্তারদের ভালোলাগার মতন করে ডাক্তারি করার পরিবেশ সৃষ্টি করে সেটা বজায় রাখা একটা সামাজিক কর্তব্য। মনে রাখি, শতকরা ৯৯ শতাংশ সদ্য পাশ করা ডাক্তার নিবেদিত প্রাণের জীব না হলেও, তারা উন্মুক্ত খোলা খাতার মনন নিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করে। বেনিয়া হয়ে নয়। যেকোনো উপায় আমাদের ‘রক্ষাকর্তা’র রক্ষা করা দরকার।

ডা. গৌতম মিস্ত্রী, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম, একজন হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

Advt.

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ ও সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার-এর যৌথ উদ্যোগে কেনা হল একটি মোটর চালিত নৌকা।

সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে রোগী পরিবহণ ও মেডিক্যাল টিমের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হবে এই যানটি।

এই নৌকাটি কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন দেশ বিদেশে থাকা শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের বন্ধুরা।

ট্যুরিস্ট সিজনে নৌকাটিকে ভাড়া দিয়ে উপার্জিত অর্থে সুন্দরবন সীমান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ চালানো হবে।

কম খরচে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন—

উৎপল মণ্ডল, সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার, ফোন: ৯০৮৮০৫০৫২৫, ৯০৭৭৯৩৩৩২

হার্ট যখন বিকল

কখন বুঝবেন আপনার হার্ট ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না, কীই-বা দীর্ঘস্থায়ী হৃদ্‌নিষ্ক্রিয়তার কারণ, এমনটা হলে ওষুধ ব্যবহার করা ছাড়া আর কী কী করতে হয়—এমন সব বিষয় নিয়ে লিখেছেন **ডা. মৃন্ময়**।

হার্ট (Heart) হল শরীরের এক পাম্পযন্ত্র, যার মধ্যে শরীরের দূষিত রক্ত (কার্বন-ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত) আসে এবং তারপর এই দূষিত রক্ত ফুসফুসে বিশুদ্ধ রক্তে (অক্সিজেন যুক্ত রক্ত) পরিণত হয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। হার্ট ফেলিয়োর হল এমন একটি অবস্থা যেখানে শরীরে এক বা একাধিক অঙ্গ বা তন্ত্রের গঠনগত বা কার্যগত অস্বাভাবিকতার দরুন হার্টের নিলয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ রক্ত পৌঁছাতে পারে না বা নিলয় (ventricle) পর্যাপ্ত পরিমাণ রক্ত ধমনির মধ্যে পৌঁছে দিতে পারে না, যার ফলে শরীরের বিভিন্ন কোষ, কলা, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিপাকের চাহিদা পূরণ হয় না।

হার্ট ফেলিয়োরের শ্রেণিবিভাগ

যদি নিলয়ের সংকোচনের অস্বাভাবিকতার দরুন হার্ট ফেলিয়োর হয় তাকে সিস্টোলিক হার্ট ফেলিয়োর বলে। অপরপক্ষে নিলয়ের মধ্যে পর্যাপ্ত রক্ত পৌঁছানোর অভাবের দরুন যে হার্ট ফেলিয়োর হয় তাকে ডায়াস্টোলিক ফেলিয়োর বলে। অনেক ক্ষেত্রে এই দুই-ই এক সঙ্গে থাকে।

এই হার্ট ফেলিয়োরের ক্ষেত্রে ইজেকশন ফ্র্যাকশন (Ejection fraction, হার্টের পাম্প ক্ষমতার একটি সূচক) কমতেও পারে বা স্বাভাবিকও থাকতে পারে, দেখা গেছে অর্ধেকের বেশি হার্ট ফেলিয়োরের ক্ষেত্রে রোগীর ইজেকশন ফ্র্যাকশন স্বাভাবিক থাকে।

বাম নিলয়ের কার্যক্ষমতার অভাবে যে হার্ট ফেলিয়োর হয় তাকে বাম হার্ট ফেলিয়োর ও ডান নিলয়ের কার্যক্ষমতার অভাবের জন্য যে হার্ট ফেলিয়োর হয় তাকে ডান হার্ট ফেলিয়োর বলে। যদিও এই দুই ধরনের হার্ট ফেলিয়োর অনেক ক্ষেত্রে একসঙ্গে ঘটে এবং একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে।

NYHA (New York Heart Association) অনুযায়ী হার্ট ফেলিয়োরকে আমরা চারটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি—

শ্রেণি ১. রোগীর হৃদ্‌রোগ বর্তমান, স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজকর্মে রোগীর কোনো অসুবিধা হয় না।

শ্রেণি ২. স্থির অবস্থায় রোগীর কোনো অসুবিধা হয় না, কিন্তু স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে রোগীর অসুবিধা হয়। অল্প কাজকর্ম করতে রোগীর অসুবিধা হয় না।

শ্রেণি ৩. স্থির অবস্থায় রোগীর কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু অল্প যেকোনো কাজ করতে রোগীর অসুবিধা হয়।

শ্রেণি ৪. স্থির অবস্থাতেও রোগীর অসুবিধা হয়।

[*এছাড়া দীর্ঘস্থায়ী হৃদ্‌নিষ্ক্রিয়তায় রোগীদের দেহের ওজন অস্বাভাবিকভাবে কমে যেতে পারে।]

হার্ট ফেলিয়োরের কারণ অনুসন্ধান

করোনারি ধমনির রোগ (ইস্কিমিক ও মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন) এবং উচ্চরক্তচাপ প্রায় ৭০-৭৫% হার্ট ফেলিয়োরের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী। এ ছাড়া অন্যান্য কারণগুলি হল—

- অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা
- জন্মগত হার্টের রোগ
- রিউম্যাটিক হার্টের রোগ
- হার্টের ভালভের রোগ
- থাইরোটক্সিকোসিস
- দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসতন্ত্রের রোগ
- বেরিবেরি (ভিটামিন বি-১ এর অভাবে হয়)
- কার্ডিওম্যায়োপ্যাথি
- হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন ধরনের অনিয়মিত সংকোচন ও প্রসারণ
- বিভিন্ন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (Calcium channel Blocker যেমন—Amlodipine, বা NSAIDS যেমন Aspirin, Ibuprofen, Diclofenac Na, Indomethacin) হার্ট ফেলিয়োরকে বাড়ায়।

এ ছাড়া শরীরের কোথাও শিরা ও ধমনির মধ্যে অস্বাভাবিক যোগাযোগ (A-V malformation) থাকলে, তার ফলস্বরূপও হার্ট ফেলিয়োর হতে পারে।

অ্যানিমিয়া, বেরিবেরি, থাইরোটক্সিকোসিস-এর ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের আউটপুট (cardiac output) বেশি হলেও হার্ট ফেলিয়োর দেখা দেয়, তাই এদের High Output failure বলে।

হার্ট ফেলিয়োর-এর ক্ষেত্রে রোগের তীব্রতার পরিপ্রেক্ষিতে উপসর্গগুলি বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যায়।

বাম নিলয়ের ফেলিয়োরের উপসর্গ

১. শ্বাসকষ্ট (Dyspnea): শ্বাসকষ্ট হল হার্ট ফেলিয়োরের সবচেয়ে প্রধান উপসর্গ। শ্বাসকষ্ট কাজ করলে বা স্থির অবস্থাতেও হতে পারে। এই শ্বাসকষ্ট শুলে বা ঘুমোলে বাড়ে (Orthopnea), এ ছাড়া অনেক সময় রাতে ২-৩ ঘণ্টা ঘুমের পর হঠাৎ শ্বাসকষ্টের জন্য ঘুম ভেঙে যায় (Paroxysmal Nocturnal Dyspnea)

২. সহজে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া: যেহেতু কলাকোষে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের চাহিদা মিটতে পারে না ও বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থ বের হতে পারে না।

ডান নিলয়ের ফেলিয়োরের উপসর্গ

১. ইডিমা: বিভিন্ন মাত্রায় হতে পারে, সাধারণত পা থেকে শুরু হলেও সারা শরীরে ইডিমা হতে পারে, হার্ট ফেলিয়োরের তীব্রতা অনুযায়ী।

২. পেটের ডান দিকে উপরিভাগে ব্যথা: লিভারের বড়ো হওয়ার দরুন ও রক্তাধিক্যের দরুন।

৩. শ্বাসকষ্ট: পূর্ববর্তী শ্বাসকষ্টের কারণ ছাড়াও বুকে জল জমার (pleural effusion) জন্যও হতে পারে।

৪. পেট ফুলে যাওয়া: পেটে জল জমার দরুন (Ascitis)।

হার্ট ফেলিয়োরের লক্ষণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষণ

১. ইডিমা
২. রক্তচাপ বেশি বা কম
৩. জুগুলার শিরার রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া
৪. ফুসফুসে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ
৫. লিভারের বৃদ্ধি

হার্ট ফেলিয়োরের দরুন অন্যান্য তন্ত্রের সমস্যা

১. কিডনি ফেলিয়োর
২. লিভারের ফেলিয়োর
৩. পেটে জল জমতে পারে
৪. ফুসফুসে জল জমতে পারে
৫. ফুসফুসে জীবাণুসংক্রমণ হতে পারে (হৃদ্‌নিষ্ক্রিয়তা ও ফুসফুসের জীবাণু সংক্রমণ একে অপরকে ত্বরান্বিত করে)
৬. দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টি হতে পারে
৭. স্ট্রোক হতে পারে
৮. শরীরে বিভিন্ন আয়ন (সোডিয়াম/পটাশিয়াম/ক্যালশিয়াম)-এর সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হতে পারে।

চিকিৎসা

হার্ট ফেলিয়োরের মূল চিকিৎসা হল সঠিক কারণ অনুসন্ধান ও তার চিকিৎসা। ওষুধ দ্বারা চিকিৎসার পাশাপাশি কিছু কিছু বেশ খুঁটিনাটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ অবশ্যই নেওয়া উচিত।

- সারাদিনে জল ১.৫ লিটার-এর বেশি পান করা উচিত নয়। (দুধ, ডাল, চা, কফি, ঝোল জাতীয় তরকারি—সবকিছু মিলে)
- সারাদিনে নুন ৫ গ্রাম-এর কম খাওয়া উচিত। অর্থাৎ তরকারি ছাড়া আলাদা করে নুন ও নুনসমৃদ্ধ ফাস্ট ফুড খাওয়া উচিত নয়। তরকারিতে নুন কম দেওয়া দরকার।
- ধূমপান, মদ্যপান ও তামাক জাতীয় নেশা ত্যাগ করা উচিত।
- মাছের তেল খাওয়া উচিত (মাছের তেলে ওমেগা-ত- অ্যানস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে যা হার্টের পক্ষে উপকারী)।
- প্রতিনিয়ত ওজন পরিমাপ করে হার্ট ফেলিয়োরের গতিবিধি বোঝা যায়।
- স্থিতিশীল রোগীদের ক্ষেত্রে তাদের সাধ্যমতো ব্যায়াম (Aerobic Exercise) করার জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়া উচিত।

ব্যথা কমানোর জন্য ব্যবহৃত: NSAIDS (যেমন Aspirin, Ibuprofen, Diclofenac, Indomethacin ইত্যাদি) ও Calcium Channel blocker (Nicardia, Amlodipine, Dittiazem, Verapamil ইত্যাদি) ইত্যাদি ওষুধের ব্যবহার যথাসাধ্য কম করা উচিত।

ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা নিয়ে বিস্তর আলোচনা এই পত্রিকার পরিসীমার বাইরে। যদি হার্ট ফেলিয়োর উপসর্গ থাকে তা হলে মূত্র বর্ধক এক বা একাধিক ওষুধের (Hydrochlorthiazide, Furosemide, Torsemide, Spiranolactone ইত্যাদি) ব্যবহার করে হার্ট ফেলিয়োরের চিকিৎসা করা হয়।

যদি হার্ট ফেলিয়োরের উপসর্গ তেমন না থাকে বা রক্তচাপ বেশির দিকে থাকে সেক্ষেত্রে উচ্চরক্তচাপ কমানোর নানা ওষুধের (এক বা একাধিক) ব্যবহার করা হয়। যেমন (Enalapril, Ramipril, Losartan, Telmesartan)

এ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিটা ব্লকার বা অন্যান্য নানা হৃদ্‌পিণ্ডের অনিয়মিত সংকোচন-এর কাজে ব্যবহৃত ওষুধ (Anti-arrythmic) দ্বারাও চিকিৎসা করা যায়।

তবে এই সমস্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে হার্ট ফেলিয়োরের গতিবিধি, রক্তচাপ, রক্তে সোডিয়াম পটাশিয়াম আয়ন ও ক্রিয়াটিনিনের মাত্রার ওপর নির্ভর করে ওষুধগুলির মাত্রা নির্ধারিত হয়। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. মৃন্ময়, এমবিবিএস, এক সরকারি মেডিক্যাল কলেজে কার্ডিওলজি বিভাগের হাউসস্টাফ। যুক্ত আছেন মেহনতি মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার আন্দোলনেও।

Advt.

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস
সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র
পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে
গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)
আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন
যোগাযোগ : ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

ইডিমা
বা শরীরে জল জমে ফোলা

ডাক্তারখানায় পা অথবা চোখমুখ ফোলা নিয়ে অনেকেই এসে হাজির হন। আবার মাঝে মধ্যে শোনা যায়, অমুক বাবুর নাকি সারা শরীরে জল জমেছে। ডাক্তারি পরিভাষায় এই ধরনের রোগলক্ষণকে আমরা বলে থাকি 'ইডিমা'—লিখেছেন **ডা. কুশল সেন।**

আমাদের শরীরের মোট ওজনের প্রায় ৫০-৬০ শতাংশ জলীয় পদার্থ থাকে। সেই জলীয় পদার্থের বেশির ভাগই থাকে কোষগুলোর মধ্যে, আর এক-তৃতীয়াংশ থাকে কোষের পরিসরের বাইরে। এই বহিঃকোষীয় স্থানে থাকা তরলের ২৫ শতাংশ থাকে রক্তের মধ্যে রক্তরস হিসাবে, বাকি ৭৫ শতাংশ থাকে কোষগুলোর মাঝখানকার স্থানে, বা সাধু বাংলায় বললে, আন্তঃকোষীয় স্থানে। যখন এই আন্তঃকোষীয় স্থানে তরলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং সেটা ডাক্তাররা বাইরে থেকে পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন, তাকে ইডিমা বলা হয়।

পিটিং ও ননপিটিং ইডিমা

রোগীকে পরীক্ষা করার সময় ইডিমা বা ফোলার ওপর চাপ দিয়ে দেখতে হয় যেখানে চাপ দেওয়া হচ্ছে সেই জায়গাটা খানিক গর্ত মতো হয়ে থাকছে কিনা; চালু কথায়, জায়গাটা 'ডেবে' যাচ্ছে কিনা। ডেবে যাওয়াটা সাময়িক, কিছুক্ষণ পরে জায়গাটা আবার আগের মতো হয়ে যায়। কিছু ইডিমা চাপ দিলে ডেবে যায় (Pitting) যেমন: হার্ট ফেলিয়োরে পা ফোলা বা Pedal edema, আবার কিছু ইডিমা ডেবে যায় না (Non pitting), যেমন মিক্সিডিমা।

ইডিমা কীভাবে হয়?

১. স্টারলিং ফোর্স

আমাদের দেহের কোষের বাইরে থাকা জলীয় পদার্থ যে দু-টি আলাদা জায়গায় থাকে, রক্তের মধ্যে রক্তরস হিসেবে, আর রক্তের বাইরে, কোষগুলোর মাঝখানকার স্থানে (আন্তঃকোষীয় স্থানে), সেটা একটু আগেই বলেছি। সেই রক্তরস আর আন্তঃকোষীয় স্থান, এ-দুটোকে আমরা দুটো আলাদা খোপ বা 'প্রকোষ্ঠ' বলে থাকি। 'প্রকোষ্ঠ' কথাটা খটোমটো, কিন্তু বিজ্ঞানের বইতে ওই কথাটাই চালু হয়ে গেছে বলে আমরা ওই শব্দটা ব্যবহার করব। এই দু-টি 'প্রকোষ্ঠ'-এর মধ্যে তরলের আদান-প্রদান সবসময় হতে থাকে। এই আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে স্টারলিং ফোর্স। এই স্টারলিং ফোর্স নির্ভর করে দু-টি প্রকোষ্ঠের কলয়ডীয় আস্রবণ চাপ (Colloidal osmotic pressure) ও উদস্থৈতিক চাপ (Hydrostatic pressure) -এর ওপর। ধমনির দিকের রক্তজালিকা থেকে জলীয় পদার্থের আন্তঃকোষীয় স্থানে প্রবেশ আর শিরার দিকের রক্তজালিকায় জলীয় পদার্থ আন্তঃকোষীয় স্থান থেকে রক্তনালীতে লসিকাতন্ত্রের মাধ্যমে প্রবেশ করা—স্টারলিং

চিত্র ১. পায়ে ইডিমা

ফোর্স এই দুটোকেই নিয়ন্ত্রণ করে। এই দুটো প্রকোষ্ঠের মধ্যে জলীয় পদার্থের আদান-প্রদান এমনভাবে হয়ে থাকে যাতে দুই প্রকোষ্ঠে জলের পরিমাণের একটা ভারসাম্য থাকে।

শিরার দিকের রক্তজালিকায় রক্তচাপ বেড়ে গেলে, অথবা শিরা কিংবা লসিকাতন্ত্রের কোথাও রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে গেলে, রক্তনালিকার উদস্থৈতিক চাপ বৃদ্ধি পায় এবং জলীয় পদার্থ আন্তঃকোষীয় স্থানে জমা হতে থাকে। কখনো তা শরীরের কোনো নির্দিষ্ট স্থানের সমস্যার জন্য হয়, তখন একটা জায়গাতেই ইডিমা দেখা যায় (localized)। কখনো-বা তা শরীরের কোনো সামগ্রিক কোনো সমস্যার জন্য হয়, আর তখন ইডিমা সারা শরীর জুড়ে হয় (Generalised)।

আবার রক্তনালিকার মধ্যেকার কলয়ডীয় আস্রবণ চাপ কমে গেলেও (যেমন অপুষ্টি, যকৃতের রোগ, খাদ্যনালী অথবা মূত্রের মধ্যে দিয়ে প্রোটিন বেরিয়ে গেলে, রক্তে অ্যালবুমিনের মাত্রা কমে গেলে ইত্যাদি) আন্তঃকোষীয় স্থানে জলীয় পদার্থ অতিরিক্ত প্রবেশ করে ইডিমা হতে পারে।

২. রক্তজালিকার ক্ষয়

রোগজীবাণুর আক্রমণ, প্রদাহ, আঘাত বা অন্য কোনো কারণে রক্তজালিকা ক্ষয়প্রাপ্ত হলে এর দেওয়ালের ব্যাপ্তিযোগ্যতা (permeability) বেড়ে যায়;

আমরা একটু আলগা ভাষা প্রয়োগ করতে চাইলে বলতে পারি, রক্তজালিকার দেওয়াল যেন 'ফুটো-ফুটো' হয়ে যায়। তখন রক্ত থেকে প্রোটিনজাতীয় দ্রব্য গিয়ে আন্তঃকোষীয় স্থানে জমা হয়। এর ফলে ওখানকার কলয়ডীয় আস্রবণ চাপ বৃদ্ধি পায়, জলীয় পদার্থ জমা হয় আন্তঃকোষীয় স্থানে—অর্থাৎ ইডিমা হয়।

৩. হৃৎপিণ্ড উপযুক্ত পরিমাণ রক্ত পাম্প না করতে পারলে অর্থাৎ পাম্প ফেলিয়োর হলে ধমনিতে কার্যকরী রক্তের আয়তন কমে যায়। শরীর তা পুনঃস্থাপন করার চেষ্টা করে শরীরে লবণ ও জলের মাত্রা ধরে রেখে (রক্তে এন্ডোথেলিন-১-এর মাত্রা এবং কিডনিতে রেনিন- অ্যাঞ্জিয়োটেনসিন -অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম এই কাজ করে থাকে)। এর ফলেও ইডিমা হয়।

যখন কোষের আভ্যন্তরীণ আস্রবণ চাপ বেড়ে যায়, তখন কোষের বাইরে থেকে জল কোষের ভেতর ঢুকতে চায়। সাধারণ অবস্থায়, আরজিনিন-ভ্যাসোপ্রেসিন নামক হরমোন আন্তঃকোষীয় স্থান থেকে কোষে জলীয় পদার্থের প্রবেশ কমায়। কিন্তু কখনো কখনো দীর্ঘদিন ধরে হৃৎপিণ্ডের পাম্প করার ক্ষমতা কমে গেলে রক্তে আরজিনিন-ভ্যাসোপ্রেসিন হরমোনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তখন কোষ ও আন্তঃকোষীয় স্থানের মধ্যে কোনো অসম আস্রবণ চাপ না থাকলেও এই হরমোন জলীয় পদার্থ কোষ থেকে আন্তঃকোষীয় স্থানে প্রবেশ করায়। ফলে ইডিমা দেখা দেয়।

ইডিমার প্রকারভেদ

ইডিমা দু-ধরনের হতে পারে। ক. জেনারালাইজড অর্থাৎ সারা শরীর জুড়ে; খ. শরীরের কোনো একটি স্থানে অর্থাৎ লোকালাইজড।

ক. জেনারালাইজড ইডিমার প্রকারভেদ

হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, কিডনি অথবা পুষ্টিজনিত সমস্যার থেকে এই ধরনের ইডিমা হতে পারে। এই ধরনের ইডিমা সাধারণত পা ফোলা (Pedal swelling), পেটে জল জমা (Ascitis), অথবা চোখের চারপাশ ফোলা (Periorbital swelling) দিয়ে শুরু হয়। তারপর ধীরে ধীরে শরীরের অন্যান্য অংশেও (যেমন শুক্রথলি, শুয়ে থাকা রোগীদের নিতম্বে) জল জমতে থাকে; আস্তে আস্তে সমস্ত শরীর ফুলে যায়—তখন একে অ্যানাসারকা (anasarca) বলে।

হৃৎপিণ্ডের পাম্প ফেলিয়োর বা সংক্ষেপে হার্টফেল: এক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড ঠিকমতো রক্ত ধমনির মধ্যে পাম্প না করতে পারায় শিরাতন্ত্রের মধ্যে রক্তের আয়তন বাড়তে থাকে এবং ধমনিতন্ত্রে কার্যকরী রক্তের আয়তন কমতে থাকে—শরীর তা পরিপুরণ করার জন্য শরীরে জল ও লবণ ধরে রাখে। ফলত আরও বেশি বেশি করে জল শিরাতন্ত্রে জমা হতে শুরু করে। রক্তজালিকার উদস্থৈতিক চাপ বৃদ্ধি পায় ও সেখান থেকে আন্তঃকোষীয় স্থানে জলীয় পদার্থ জমা হয়—ইডিমা হয়।

এ ক্ষেত্রে রোগীর প্রাথমিক উপসর্গ হলে ভারী বা পরিশ্রমের কাজ করলে হাঁপিয়ে পড়া। এসব রোগীর রোগের প্রথম দশায় কেবল পা ফোলে, আর তা ফোলে মূলত বিকালের দিকে; রোগীর বিকালে জুতো পড়তে অসুবিধা হয়। রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে পেট, ফুসফুস এবং শরীরের অন্যান্য অংশে জল জমে।

কিডনির রোগ: কিডনি আমাদের শরীরে ছাঁকনির মতো কাজ করে রক্ত পরিশোধন করে। কিডনির অসুখে তার এই ছাঁকনি ঠিকমতো কাজ করতে পারে না, ফলে রক্ত থেকে প্রোটিনজাতীয় পদার্থ বেরিয়ে যায়। ফলে রক্তের কলয়ডীয় আস্রবণ চাপ কমে যায়। আবার কিডনি রক্ত থেকে জলীয় পদার্থ ও লবণ যতটা বের করে দেওয়ার কথা ততটা পারে না—এতে রক্তজালিকার উদস্থৈতিক চাপ বৃদ্ধি পায়। রক্ত থেকে জলীয় পদার্থ আন্তঃকোষীয় স্থানে জমা হয়—ইডিমা হয়।

এ ক্ষেত্রে রোগীর প্রথমে চোখের চারপাশে জল জমে, সাধারণত ভোরবেলা বেশি। এরপর রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পা ফোলে, তারপর পেট, শুক্রথলিতে জল জমতে শুরু করে। এর সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাব কমে যাওয়া, ফেনাযুক্ত প্রস্রাব হওয়ার অভিযোগ নিয়ে রোগী ডাক্তারখানায় আসে। এই রোগীদের অনেকেরই উচ্চ রক্তচাপ থাকে, কারও কারও রক্তে শর্করার পরিমাণও বেশি থাকে।

যকৃতের রোগ: যকৃতের অসুখে যকৃৎ শিরা (Hepatic vein)-র মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়, শিরাতন্ত্রের মধ্যে রক্ত জমতে থাকে। যকৃতের মধ্যে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, যেটা আবার মূত্রের মধ্য দিয়ে শরীর থেকে লবণ ও জল বেরিয়ে যাওয়াকে বাধা দেয়। আবার যকৃতের অসুখে রক্তে উপস্থিত অ্যালবুমিন নামক এক প্রোটিন, যেটা যকৃৎ থেকে তৈরি হয়, সেটা কমে যায়। এতে রক্তের কলয়ডীয় আস্রবণ চাপ কমে যায়—ইডিমা হয়। এই ক্ষেত্রে রোগীর পেটে জল জমে বা পেট ফুলে যায়, তারপর জল ফুসফুসে, পায়ে জমতে থাকে। কারও কারও ক্ষেত্রে পাণ্ডুরোগ বা জন্ডিস হয়। অনেকক্ষেত্রেই রোগীর মদ্যপানের অভ্যাস থাকে।

অপুষ্টিজনিত ইডিমা: দীর্ঘদিন ধরে খাবারে শরীরের প্রয়োজন মেটার মতো প্রোটিন না থাকলে রক্তে প্রোটিনের মাত্রা কমতে থাকে। এতে রক্তের কলয়ডীয় আস্রবণ চাপ কমে। আবার কম পুষ্টিযুক্ত খাবার খেলে শরীরে যে লবণের ঘাটতি হয় তা মেটাবার জন্য কিডনি রক্ত থেকে লবণ ও জলকে মূত্রের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া থেকে আটকায়—এতে রক্তের উদস্থৈতিক চাপ বৃদ্ধি পায়—ইডিমা দেখা দেয়।

ওষুধজনিত ইডিমা: নিম্নলিখিত ওষুধ থেকেও ইডিমা হতে পারে। কোনোটা কিডনির অভ্যন্তরে রক্তনালীর সংকোচন ঘটিয়ে (রেনিন- অ্যাঞ্জিয়োটেনসিন-অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম-এর মাধ্যমে); কোনোটা ধমনিকার প্রসারণ ঘটিয়ে (ধমনিতন্ত্রে কার্যকরী রক্তের আয়তন কমিয়ে); কোনোটা রক্তজালিকার ক্ষয়সাধন করে; কোনোটা বা শরীর থেকে লবণ ও জল বেরিয়ে যাওয়াকে আটকে (যথা স্টেরয়েড হরমোন) ইডিমা ঘটায়।

যেসব ওষুধ ইডিমা ঘটাতে পারে

- NSAIDS (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) প্যারাসিটামল, আইবুপ্রোফেন ইত্যাদি
- রক্তচাপ কমানোর ওষুধ
  - ❖ সরাসরি রক্তনালিকা প্রসারক-হাইড্রালাজিন, ক্লোনিডিন, মিথাইলডোপা, গুয়ানেথিডিন, মিনক্সিডিল ইত্যাদি।
  - ❖ ক্যালশিয়াম চ্যানেল ব্লকার-অ্যামলোডিপিন, ভেরাপামিল ইত্যাদি
  - ❖ আলফা চ্যানেল ব্লকার

- রক্তে শর্করা কমানোর ওষুধ—থায়াজোলিডিনডায়োন গ্রুপের (পায়োগ্লিটাজোন)
- স্টেরয়েড হরমোন----গ্লুকোকটিকয়েড, ইস্ট্রোজেনস, প্রোজেস্টিনস, অ্যানাবলিক স্টেরয়েডস।
- সাইক্লোস্পোরিন
- বৃদ্ধিকারক হরমোন (Growth hormones)
- ইমিউনোথেরাপি—Interleukin 2, OKT3 monoclonal therapy

জীবনহানিকর সংক্রমণ: সারা শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়ে গেলে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় রক্তজালিকার ক্ষয়সাধন (Capillary damage) হয়, আমরা একটু আলগা ভাষা প্রয়োগ করতে চাইলে বলতে পারি, রক্তজালিকার দেওয়াল যেন 'ফুটো-ফুটো' হয়ে যায়। ফলে সেক্ষেত্রে জেনারালাইজড ইডিমা হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ইডিমা: গর্ভাবস্থায় শরীরের সংবহনতন্ত্রে বহমান জলীয় পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া মাতৃজঠরে বৃদ্ধি পেতে থাকা সন্তানের চাপে কখনো কখনো পেটের ভেতরের বড়ো শিরাতে রক্তচলাচলে বিঘ্ন ঘটে (Inferior vena cava obstruction)—তখন পায়ে ইডিমা দেখা যেতে পারে। এই কারণে গর্ভাবস্থায় মায়েদের বামদিকে কাত হয়ে শোয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এ ছাড়াও গর্ভাবস্থায় পায়ের শিরায় রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া (Deep vein thrombosis), প্রিএক্লাম্পশিয়া ইত্যাদি রোগেও ইডিমা দেখা যেতে পারে। এই কারণে গর্ভাবস্থায় মায়েদের বামদিকে কাত হয়ে শোয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এগুলো নিয়ে এখানে বিশদ বলার অবকাশ নেই।

২. লোকালাইজড ইডিমা

সাধারণভাবে আমাদের শরীরের কোথাও (প্রধানত হাত বা পায়ে) পরিবহণতন্ত্রের কোথাও (প্রধানত শিরাতন্ত্র বা লসিকাতন্ত্রে) পরিবহণে বিঘ্ন ঘটলে পরিবহণতন্ত্রের উদস্থৈতিক চাপ বৃদ্ধি পায় এবং একটা বড়ো পরিমাণ জলীয় পদার্থ পরিবহণতন্ত্র থেকে আন্তঃকোষীয় স্থানে এসে জমা হয়—শরীরের সেই বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে (limb) ইডিমা দেখা যায়। আর লসিকাতন্ত্রের পরিবহণে বিঘ্ন ঘটলে এর সঙ্গে সঙ্গে আন্তঃকোষীয় স্থানে প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়—সেখানকার কলয়ডীয় আস্রবণ চাপ বৃদ্ধি পায়। এর ফলেও জলীয় পদার্থ পরিবহণতন্ত্র থেকে এসে সেখানে জমা হয়ে ইডিমা হতে পারে। থ্রম্বোফ্লেবাইটিস (তঞ্চনজনিত কারণে শিরাতন্ত্রে রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে গিয়ে শিরাতে প্রদাহ), ফাইলেরিয়া, লসিকাতন্ত্রের প্রদাহ (lymphangitis) হলে, কোনো টিউমার বড়ো হয়ে শিরাতন্ত্র বা লসিকাতন্ত্রে পরিবহণে বিঘ্ন ঘটালে এই ধরনের ইডিমা হয়।

এ ছাড়া অ্যালার্জি থেকে জিভ অথবা গলার ভিতরে ইডিমা হতে পারে। শরীরেরর কোনো অংশে প্রদাহ (inflammation) দেখা দিলে, পুড়ে গেলে সেখানেও ইডিমা হতে পারে—রক্তজালিকার ক্ষয়সাধন (Capillary damage) এর মূল কারণ।

চিত্র ২. পায়ের পাতায় ইডিমা

ইডিমার অন্যান্য কারণ

শরীরে থাইরয়েড হরমোন কমে গেলে (Hypothyroidism) মিক্সিডিমা বলে এক ধরনের ইডিমা হয়। আবার শরীরে থাইরয়েড হরমোন বেড়ে গেলেও আমাদের টিবিয়া বলে পায়ের হাড়ের ওপর এই ধরনের ইডিমা হয়—এই ধরনের ইডিমায় জলীয় পদার্থের বদলে হায়ালিউরোনিক অ্যাসিড নামক এক পদার্থ জমা হয়। ফলে এই ইডিমার ওপর চাপ দিলে ডেবে যায় না (Non-pitting)।

চিকিৎসা

- সাধারণভাবে জেনারালাইজড ইডিমার মূল কারণগুলো (হার্টফেল, কিডনির রোগ, যকৃতের রোগ, অপুষ্টি, থাইরয়েড হরমোনের রোগ, জীবনহানিকর সংক্রমণ ইত্যাদি) চিহ্নিত করা এবং তার চিকিৎসা করা।
- যদি কোনো ওষুধকে ইডিমার কারণ বলে চিহ্নিত করা যায় তাকে তৎক্ষণাৎ বন্ধ করা এবং বিকল্প ওষুধ ব্যবহার করা।
- অ্যালার্জিজনিত কারণে ইডিমা হলে অ্যালার্জির চিকিৎসা করতে হবে।
- রক্ততঞ্চনজনিত কারণে শিরাতন্ত্রে রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে যদি ইডিমা হয় সেক্ষেত্রে রক্ত তরল করার ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা যেতে পারে।
- যে টিউমার বড়ো হয়ে শিরাতন্ত্র বা লসিকাতন্ত্রে পরিবহণে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, অপারেশন করে বা ওষুধ অথবা রে দিয়ে চিকিৎসা করা সেই টিউমারের আকার ছোটো করে ফোলা বা ইডিমা কমানো যেতে পারে।
- লোকালাইজড ইডিমা কমানোর জন্য ইলাস্টিক দেওয়া মোজা ব্যবহার করা যেতে পারে।

মোটের ওপর, চিকিৎসা ব্যাপারটা ইডিমার কারণ অনুযায়ী করতে হবে। সেটা আর এক নিবন্ধের বিষয়। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. কুশল সেন, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি একটি হাসপাতালে আংশিক সময়ের চিকিৎসক।

শিশু বিনোদনে কার্টুনের ভূমিকা ও প্রভাব

''বাবাই 'অসহিষ্ণুতা' কী?'' তাতাই প্রশ্ন করে। তাতাইয়ের বাবা অফিস থেকে ফিরে বিখ্যাত এক বাংলা টিভি চ্যানেলে 'রাজনীতির তরজা' লড়াই দেখছিলেন। সাত বছরের তাতাই ওদের চেঁচামেচির কিছুই বুঝছিল না, কেবল একটা শব্দই বারবার উচ্চারিত হচ্ছিল 'অসহিষ্ণুতা'। ''কী জানি বাবা,'' তাতাই মনে মনে ভাবে, ''এরা মনে হচ্ছে পাওয়ার রেঞ্জারের মতো জোরে জোরে লড়াই আরম্ভ করবে এবার। অসহিষ্ণুতা হয়তো নতুন কোনো মিসাইল! বেশ মজা হবে কিন্তু। বাবাই-ও তাহলে ফাইটিং ভালোবাসে!'' এতক্ষণ যা পড়লেন আপনারা তা একটি শিশুর বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে পরিবর্তিত ধারণা (altered idea)। এই পরিবর্তিত ধারণার ভিত্তি হল বিনোদন জগতের অধীশ্বর টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত একটি অ্যানিমেশন ধারাবাহিক। আজকের শিশুর জীবনে টেলিভিশন আসলে দাদু-ঠাকুরমার প্রতিস্থাপক। এই প্রতিস্থাপকটি কী ভূমিকা পালন করছে শিশুর জীবনে আর তার প্রভাবগুলি কী কী সেই নিয়ে এবারের নিবন্ধ, লিখেছেন **রুমঝুম ভট্টাচার্য**।

শৈশব মানবজীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই পর্যায়ে শিশু তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতের (interaction) ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে। তার আচরণও গভীরভাবে পরিশীলিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হতে থাকে। পরিবারের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে যখন সে স্কুলে ভর্তি হয় তখন সে সামাজিকতার শিক্ষা পায়। এই সময়ে পরিবেশ ও পরিজন তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক যুগে টিভি শিশুর এক অন্যতম পরিজন বলে গণ্য করা যায়। টিভি-র মাধ্যমে শিশুর সামনে উন্মুক্ত হয় এক বৃহত্তর জগৎ—যে জগতে আছে প্রকৃতি, খেলা, কল্পনার রঙে ডোবানো বিভিন্ন কার্টুন চরিত্র আর আছে বিজ্ঞাপন। এইসব কিছুর গভীর প্রভাব পড়ে শিশুর মনোজগতে। বিশেষত যেসব শিশুর প্রাত্যহিক জীবনের কড়া রুটিনের মধ্যে একমাত্র বিনোদন হল টিভি দেখা। বড়োরা অনেকক্ষেত্রেই নিজেদের দায় এড়াতে শিশুটিকে বসিয়ে দেন টিভি-র সামনে। কিন্তু সে কী দেখছে, তার মনোজগতে দৃশ্যবস্তুর কী প্রভাব পড়ছে সে সম্বন্ধে অধিকাংশ অভিভাবকই অবহিত নন। অথচ যখন তাঁরা শিশুটির মধ্যে আচরণগত সমস্যা, যেমন অতিরিক্ত চঞ্চলতা, অমনোযোগিতা, ভায়োলেন্স ইত্যাদি লক্ষ করেন তখন মনোবিদের শরণাপন্ন হন। এইসব আচরণগত সমস্যার মূল অনেক সময়েই নিহিত থাকে অতিরিক্ত টিভি দেখা এবং যে বিষয়গুলি টিভিতে দেখছে তার মধ্যে।

বিশেষত কার্টুন দেখা শিশুদের বিশেষ প্রিয়, কারণ কার্টুনে আলো, দ্রুত গতি ইত্যাদির ব্যবহার খুব সহজেই শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেসব কার্টুনে ভায়োলেন্স মূল উপভোগ্য বিষয় হিসাবে বিভিন্ন আঙ্গিকে (হাস্যরসাত্মক বা থ্রিলার) পরিবেশিত হয় তাদের কুপ্রভাব সম্বন্ধে দেশেবিদেশে অনেক গবেষণা হয়েছে।

কার্টুনের কু-প্রভাব

১. ধ্বংসাত্মক (destructive) ও হিংসাত্মক (aggressive) আচরণ বৃদ্ধি: রাগ হলে খেলনা বা অন্য জিনিসপত্র ভাঙচুর।

২. বাইরের জগৎ সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা: পৃথিবীর সবাই সবাইকে মেরে প্রতিশোধ নিতে চায়, সেটাই টিকে থাকার একমাত্র উপায়।

৩. মারামারি ও যুদ্ধ দেখতে দেখতে হিংসার প্রতি অসংবেদনশীল হওয়া: শিশুমন বারবার হিংসা ও যুদ্ধ দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে বাস্তব জীবনে হিংসাত্মক ঘটনায় তার মনে বিশেষ কোনো অনুভূতি তৈরি হয় না। কারণ হিংসা প্রকাশ তার কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

৪. শিশু কার্টুনের চরিত্রগুলোর সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে ও অবচেতনভাবে তাদের আচরণে সেই চরিত্রগুলোর হাবভাব অনুকরণ করার প্রবণতা দেখা যায়।

৫. কার্টুনের দ্রুতগতি দেখতে দেখতে শিশুর মস্তিষ্ক অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে বিশেষ করে দীর্ঘ সময় ধরে টিভি দেখার অভ্যাস থাকলে, সাধারণ পড়ার বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ায় শিশু অসুবিধা বোধ করে।

৬. কিছু কিছু কার্টুনে হিংসা প্রকাশকেও খুব হালকা চালে হাসি-কৌতুকের মোড়কে পেশ করা হয়। এই ধরনের কার্টুন দেখার ফলে শিশুমনে হিংসার ফল সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা তৈরি হয়। বেড়াল-ইঁদুরের রেষারেষি দেখাতে গিয়ে দেখানো হচ্ছে ইঁদুরটিকে এমন মারা হল যে সে চৌকো বা গোল হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে আবার সে স্বাভাবিক আকারে ফিরে এল। এই সব দেখতে দেখতে শিশু বাস্তবজগৎ সম্বন্ধেও এমন বিকৃত ধারণা তৈরি করতে পারে; ভুললে চলবে না যে তার ধারণাগুলো সবই গঠনগত স্তরে আছে, সেগুলো সম্পূর্ণ গড়ে ওঠেনি।

কী করা উচিত ও কীভাবে?

প্রথমত টিভি দেখার সময় নির্ধারিত করে দিতে হবে। অভিভাবকদের মনে রাখতে হবে টিভি কখনোই দক্ষ 'বেবি সিটার' নয়।

দ্বিতীয়ত বাচ্চাকে বাইরের গঠনমূলক খেলাধুলোয় উৎসাহিত করতে হবে।

তৃতীয়ত টিভি-তে শিক্ষামূলক বা অন্যান্য হাতের কাজ (craft) শেখানো হয় যেসব প্রোগ্রামে সেগুলো দেখতে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

বাচ্চা যখন টিভি দেখবে, তার সঙ্গে অভিভাবকদেরও বসে দেখা উচিত সে কী দেখছে। অবশ্যই একেবারে সমস্ত অভ্যাস জোর করে ছাড়ানোর চেষ্টা না করা ভালো তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক মনোবিদ ও প্রাবন্ধিক।

লাইকেন প্লেনাস

ডা. শর্মিষ্ঠা দাস

হাতে-পায়ে ছোটো ছোটো কালচে বেগুনি রঙের চ্যাপটা মতো দেখতে গোটা বা ফুসকুড়ি, চুলকায় খুব, অনেকদিন ধরে আছে—সারতেই চাইছে না—ডাক্তারবাবু কী যে হল? এরকম খুব মারাত্মক নয় অথচ রোগীরা বিরক্ত হয়ে যায় দীর্ঘস্থায়ী ঘ্যানঘেনে কষ্টে—এই রোগটার আবার ঠিক প্রচলিত কোনো বাংলা নামও নেই! তাই অসুখটা কী সেটাই যদি না জানা থাকে অশান্তি আরও বেড়ে চলে। এই চর্মরোগটার নাম লাইকেন প্লেনাস (Lichen Planus)। যেহেতু খুব বিরল নয়—জানা থাকলে ''চেনা শত্রুর'' সঙ্গে লড়াইটা সুবিধে হবে।

লাইকেন প্লেনাস কাদের হয়?

ছেলে মেয়ে উভয়ের হয়, মেয়েদের একটু বেশি, প্রাপ্তবয়স্কদের লাইকেন প্লেনাস রোগের প্রবণতা বেশি। কমবয়সিদেরও হতে পারে।

কেন হয়?

এই তো মুশকিল! সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোষবাহিত ইমিউনিটির একটু গণ্ডগোলের জন্য হয়—কোনো কারণ ছাড়াই বিশেষ কিছু রোগ প্রতিরোধী শ্বেতকণিকা বেড়ে যায়। কিছু ওষুধের প্রভাবেও লাইকেন প্লেনাস হয়। যেমন—কিছু যক্ষ্মার ওষুধ, কিছু ম্যালেরিয়ার ওষুধ, gold salt, β blocker, spironolactone, penicillamine, thiazide ইত্যাদি। ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলে খুব তাড়াতাড়ি ওষুধ বন্ধ করলেই সেরে যায়। এক্ষেত্রে রোগীর খুব বেশি কিছু করণীয় নেই, এইসব ওষুধ খেতে খেতে গায়ে লাইকেন প্লেনাস-এর গোটা দেখলে ডাক্তারবাবুকে ওষুধটির বিকল্প কিছু ওষুধ ভাবতে হবে।

গায়ে তো হরদম কত কী বেরোয়, কী করে বুঝব কোনটা ঘামাচি আর কোনটা লাইকেন প্লেনাস?

প্রথমে যা বললাম—লাইকেন প্লেনাসের গোটাগুলোর রং কালচে বেগুনি, গোটার ওপরটা মানে মাথাটা চ্যাপটা, অন্য ফুসকুড়ির মতো ছুঁচোলো নয়, প্রধানত হাত ও পায়ের ভাঁজের বা ভেতরের দিকটাতে হয়, একসঙ্গে ছাড়া ছাড়া ভাবে অনেকগুলো হয়, গায়েও হতে পারে। খুব চুলকোয়, গোটাগুলো নিখুঁত নিটোল গোলের বদলে বহুকোণ বিশিষ্ট হয়। ভালো করে দেখলে চ্যাপটা মাথাটার উপরে অনেক কাটাকুটি দাগ থাকে আর অতি সরু সাদা সুতোর মতো কিছু কাটাকুটি নকশা তাতে লেপটে থাকে। চামড়াতে স্বাভাবিকভাবে যে কাটাকুটি থাকে সেটাই এখানে বেড়ে যায়। কখনো কখনো লাইকেন প্লেনাসের গোটাগুলো উঁচু ঢিবির মতোও হয়ে থাকে, কখনো-বা ফোস্কার মতো। আবার এক ধরনের লাইকেন প্লেনাসে শুধু চামড়াতে গাঢ় রঙের ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায় কোনো গোটাই হয় না।

গা, হাত, পায়ের ত্বক ছাড়া আর কোথায় কোথায় লাইকেন প্লেনাস হতে পারে?

মুখগহ্বরে—গালের ভিতরে, তালুতে, জিভে সাদা বেগুনি রঙের উঁচু ঘায়ের মতো দেখা যায়।

মাথায়—ছোটো ছোটো বৃত্তাকার জায়গায় চুল উঠে যায়, চুলের গোড়া নষ্ট হয়ে গিয়ে জায়গাটা চকচকে হয়ে শুকিয়ে যায়।

নখে—নখ মোটা হয়ে নীচের মাংস থেকে আলাদা হয়ে যায়, লম্বা লম্বা ফাটল দেখা যায়।

লাইকেন প্লেনাস কি সারে? চিকিৎসা কী?

লাইকেন প্লেনাস একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ। অনেক সময় কয়েক মাস বা কয়েক বছরও লেগে যায় সারতে।

প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত অঞ্চলে স্টেরয়েড মলম লাগাতে দেওয়া হয়। সঙ্গে Tacrolimus মলমও লাগানো হয়। বেশি চুলকানোর সমস্যা থাকলে চুলকানো কমার জন্য অ্যালার্জির ওষুধ খাওয়া যায়।

গায়ে ও মুখের লাইকেন প্লেনাসে আলাদা ধরনের স্টেরয়েড মলম লাগাতে হয়। শুধু লাগানোর ওষুধে না কমলে বা বিস্তৃত অঞ্চলে হলে কিছু ওষুধ খেতে হয়। কোন রোগীকে কী ওষুধ দেওয়া হবে তা রোগীর শারীরিক অবস্থা, রোগের বিস্তার এইসব বিচার করে চিকিৎসকই ঠিক করবেন।

যে সব ওষুধ লাইকেন প্লেনাসের চিকিৎসায় প্রচলিত—Prednisolone, Retinoid, Cyclosporin। উঁচু ঢিবির মতো লাইকেন প্লেনাসে আক্রান্ত অঞ্চলে Triamcinolone ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

লাইকেন প্লেনাসে কী কী নিষেধ?

রোগী ও তার পরিবার জিজ্ঞাসা করেন কী খাব আর কী খাব না! খাবারের সঙ্গে এই রোগের কোনো সম্পর্ক নেই—সব কিছুই খাবেন। কোনো বিশেষ ওষুধ থেকে যদি সমস্যাটা দেখা যায় তাহলে অবশ্যই সেই ওষুধ বন্ধ করতে হবে।

আরও অনেক চর্মরোগের মতো লাইকেন প্লেনাসেও একটা ব্যাপার দেখা যায়—যেখানে বেশি চুলকানো, ঘষা বা রগড়ানো হয় সেই জায়গার ত্বকে নতুন নতুন গোটা দেখা যায়, তাই যতটা সম্ভব চুলকানো নিষেধ। অনেকের অভ্যাস আছে স্নান করার সময় ছোবড়া জাতীয় জিনিস দিয়ে বা গামছা দিয়ে খুব রগড়ে রগড়ে সাবান মাখা ও গা মোছা—এই সব প্রক্রিয়া যাতে ত্বকের উপরে ''ঘর্ষণ'' হয় সেগুলো সব নিষেধ। খুব বেশি উষ্ণ জলে স্নান না করাই ভালো।

সুতরাং লাইকেন প্লেনাস রোগটি এমন অবহেলাও করবেন না, আতঙ্কিতও হবেন না—শুধু ধৈর্য ধরে চিকিৎসা করিয়ে যাবেন।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. শর্মিষ্ঠা দাস, এমবিবিএস, ডিভিডি, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ

সকলের জন্য স্বাস্থ্য: কোনো আকাশকুসুম কল্পনা নয়

ভারত সরকারের যোজনা কমিশন ডা. শ্রীনাথ রেড্ডির নেতৃত্বে এক 'উচ্চ পর্যায়ের কমিটি' গঠন করেছিলেন ইউপিএ সরকারের আমলে, আর তাতে ডা. রেড্ডি সকলের জন্য স্বাস্থ্যের কথা বলেছিলেন, ও দেখিয়েছিলেন বাজেট-বরাদ্দ কিছু বাড়ালে সেটা সম্ভব। ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ *এইসময়* পত্রিকায় প্রকাশিত রূপসা রায়ের নেওয়া ভারতের পাবলিক হেলথ্ ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট শ্রীনাথ রেড্ডির সাক্ষাৎকারের নির্যাস এখানে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পাঠকের কাছে তুলে ধরছি।

''২০১৫ সালেও রাষ্ট্রপুঞ্জের সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্টের লক্ষ্যটি আমাদের দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কিন্তু গ্রহণ করেছিলেন, এবং তারই তিন নম্বর লক্ষ্যটি ছিল স্বাস্থ্য নিয়ে, তার মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং তার জন্য আর্থিক সুরক্ষার প্রশ্নটিও ছিল। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং ভ্যাক্সিনের বিষয়টিও তার মধ্যে ছিল। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি, মূলগতভাবে আমরা সার্বজনীন স্বাস্থ্যের লক্ষ্যটি গ্রহণ করে নিয়েছি, এবং তা বাধ্যতামূলকভাবে ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছি। ২০০৫ সালেই হোক বা ২০১৫ . . . ভারত রাষ্ট্র তার জনগণের কাছেই এই ব্যাপারে তার দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েছে। এ বারে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটিতেও কিন্তু (২০১২-২০১৭), স্বাস্থ্য বিষয়ক পরিচ্ছেদে প্রথমেই সার্বজনীন স্বাস্থ্যপরিষেবা অর্জন করার কথা বলা হয়েছে।''

প্রসঙ্গক্রমে ডা. রেড্ডি বলেন যে ফিলহাল ভারতে জিডিপি-র বাড়বাড়ন্ত নিয়ে জোর হইচই . . . কিন্তু যদি সত্যিই গরিব মানুষের ওপর বোঝা কমাতে হয়, তা হলে আমাদের সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থাটি করতেই হবে। মানুষ যে গরিব থেকে আরও গরিব হয়ে পড়ছে তার একটি প্রধান কারণ হল, তারা তাদের চিকিৎসার বিপুল ব্যয় বহন করতে করতে ফতুর হয়ে যাচ্ছে। নানাবিধ হিসাব অনুযায়ী, প্রতি বছর ভারতে অন্তত ৫ কোটি থেকে ৬ কোটি তিরিশ লক্ষ মানুষ স্বাস্থ্য তথা চিকিৎসা সংক্রান্ত বিপুল খরচের ঠেলা সামলাতে পারে না; গরিব হয়ে যায়। এইটা ঠেকানোর একমাত্র উপায় সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা—যেখানে মানুষ নিখরচায় প্রাথমিক চিকিৎসা পাবেন, জরুরি ওষুধগুলি পাবেন।

আর একটা কথা, এ দেশে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় সবচেয়ে কম খরচ হয়। সরকারি খরচে যাতে সাধারণ মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলি, বিশেষত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাটি দেওয়া যায় . . . ''আমাদের দেশে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের মাত্র ৩০ শতাংশ খরচ সরকার বহন করে। ভারতের মতো অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির বেশির ভাগগুলিতেই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অন্তত ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ খরচ বহন করে সরকার।''

তাঁর কথায় দেশবাসীর কাছে একটা সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা দেওয়ার প্রয়াস না নিলে বা না দিলে, অন্তত প্রাথমিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে; তা হলে তাঁদের আরও বেশি বেশি অসুস্থতার দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। তখন কিন্তু আর তাঁদের জন্য আর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ও তার চিকিৎসায় কুলোবে না। তাঁদের তখন দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধাপের অর্থাৎ আরও জটিল চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। তারা আরও গরিব হয়ে পড়বে।

তাঁর মতে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ অন্তত একটা পর্যায় পর্যন্ত সাধারণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল না হলে, সেই স্বাস্থ্য পরিষেবার মানটি নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা থাকবে না। খারাপ স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়েও পার পেয়ে যাওয়া যাবে। সমাজের আর্থিক-স্বচ্ছল অংশটি এই ব্যবস্থাটি সম্পর্কে নিস্পৃহ থেকে হাত ঝেড়ে ফেলতে কসুর করবে না। ফলে ব্যবস্থাটি ক্রমে খারাপ থেকে আরও খারাপ হতে থাকবে তাতে শেষ পর্যন্ত যেটা দাঁড়াবে, তা হল গরিব মানুষের জন্য একটি খারাপ স্বাস্থ্যব্যবস্থা, যাকে বলা যেতে পারে 'পুয়োর সিস্টেম ফর পুয়োর পিপল'।

স্বাস্থ্যবিমা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য: . . . ব্যবস্থাটিতে শুধুমাত্র হাসপাতালের চিকিৎসা খরচ (হসপিটালাইজড কেয়ার) ধরা আছে। প্রাথমিক চিকিৎসা বা আউটপেশেন্ট কেয়ার বা দীর্ঘদিনের জন্য ওষুধের বন্দোবস্তের ব্যবস্থা, তার কোনো সুযোগসুবিধা এতে নেই। সেটা সরকারি রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার মতো সরকারি স্বাস্থ্য বিমার ক্ষেত্রেও সত্যি। কোনোরকম আর্থিক সুরক্ষাও সেটি দিতে পারছে না। কিন্তু হাসপাতালের চিকিৎসাটুকু বাদ দিলে বাদবাকি যে চিকিৎসার বিপুল খরচ তা কিন্তু রোগীকে নিজের পকেট থেকেই দিতে হচ্ছে। সেটা মোট খরচের প্রায় ৭০ শতাংশ।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ মডেল সম্পর্কে ডা. রেড্ডি জানান—এর অনেক ধরন রয়েছে। . . . প্রথমে এটির জন্য একটা সাধারণ কাঠামো তৈরি করা দরকার। এবং সেখানে কী কী পরিষেবা দিতে হবে, কী

কী বিষয়ে দায়বদ্ধ থাকতে হবে, তার জন্য একটি পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। . . . স্বাস্থ্যে বেসরকারি ক্ষেত্রটিও যে সব জায়গায় একই রকম, তা নয়। কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থা বেশ ভালো পরিষেবা দেয়, আবার কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থা শুধু মুনাফার দিকে নজর রাখে; যেনতেন প্রকারেণ রোগীর কাছ থেকে টাকা আদায় করাটাই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে আমরা বেসরকারি উদ্যোগগুলিকে সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। যেখানে তাদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া থাকবে, এত টাকার মধ্যে এতটা পরিষেবা দিতে হবে, পরিষেবার মান যাতে ঠিক থাকে, তার উপর নজরদারি করতে হবে, একটা দূর পর্যন্ত বেসরকারি সংস্থাগুলিকে দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করতে বাধ্য করতে হবে। যদি এটা করা যায় তাহলে আমরা পিপিপি-কে 'পার্টনারশিপ ফর পাবলিক পারপাস' বলতে পারি। তাঁর মতে, পিপিপি 'পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ না হয়ে 'পার্টনারশিপ ফর পাবলিক পারপাস' হওয়া উচিত। সেটাই হবে পিপিপির সবচেয়ে

দেশবাসীর কাছে একটা সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা দেওয়ার প্রয়াস না নিলে বা না দিলে, অন্তত প্রাথমিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে; তা হলে তাঁদের আরও বেশি বেশি অসুস্থতার দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। তখন কিন্তু আর তাঁদের জন্য আর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ও তার চিকিৎসায় কুলোবে না। তাঁদের তখন দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধাপের অর্থাৎ আরও জটিল চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। তারা আরও গরিব হয়ে পড়বে।

ভালো অর্থ। সেখানে জনস্বার্থ, প্রদেয় পরিষেবা ও দায়বদ্ধতাকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

ডা. রেড্ডি প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে সরাসরি স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন অনেকগুলো বিষয় আছে যা দিয়ে স্বাস্থ্য নির্ধারিত হয়। জল, পরিচ্ছন্নতা, বাসস্থান, খাবার, পুষ্টি সামাজিক স্থিতাবস্থা এবং ব্যক্তিগত আয়, শিক্ষা, লিঙ্গচেতনা, সবগুলিই কিন্তু স্বাস্থ্যের নির্ধারক। প্রয়োজনীয় এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি ছাড়া স্বাস্থ্য সম্ভব নয়। তার জন্য আমাদের খাদ্য সুরক্ষা প্রয়োজন। . . . কিন্তু উলটোটাও সত্যি। যদি স্বাস্থ্য ভালো না থাকে, তবে যতই পুষ্টিকর খাবার হোক না কেন, কোনো লাভ হবে না। যদি কোনো শিশু ডায়রিয়াতে ভোগে, তা হলে তাকে যত ভালো খাবারই দেওয়া হোক না কেন, তা কি তার কোনো উপকারে লাগবে? এগুলো পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল।

সবার জন্য স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ক্যানসারের চিকিৎসা করতে গিয়ে মানুষ প্রায় নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছেন। ক্যানসারের চিকিৎসা কীভাবে হতে পারে সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায়? তিনি আমাদের নজরে আনেন, খুব কম দেশই রাতারাতি একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার রূপ দিতে পেরেছে—থাইল্যান্ডে লেগেছে কুড়ি, বছর, মেক্সিকোতে বারো—তবুও সেখানে সব ধরনের রোগের পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

ব্যবস্থার প্রথম ধাপটি হল—

১. সাধারণের প্রাথমিক চিকিৎসা-স্বাস্থ্য পরিষেবাটিকে নিশ্চিত করা। এর সঙ্গে কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া। ক্যানসার রুখতে প্রাথমিকভাবে তামাক, অ্যালকোহলের নেশাটা কমানো বা যাতে হেপাটাইটিস বি-এর মতো রোগ আটকানো যায়, তার জন্য টিকাকরণ। আবার প্রাথমিকভাবে ক্যানসার নির্ণয় করার ব্যবস্থাটিও জরুরি। প্রাথমিক স্তরে ক্যানসার নির্ণয় সম্ভব হলে, রোগটি জটিল হওয়ার সুযোগ পায় না।

২. ধীরে ধীরে চিকিৎসার দ্বিতীয় ধাপ থেকে শুরু করে অস্ত্রোপচারের মতো বিষয়গুলিকেও ইউনিভার্সাল হেলথ্‌কেয়ার প্যাকেজের আওতায় নিয়ে আসা। তার পরে অতিরিক্ত পরিষেবাটিকেও এর আওতায় আনা। যেখানে প্রসূতি, শিশুর স্বাস্থ্য-সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। হতে পারে, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আমি হাইপারটেনশনের মতো অসুখকে আনতে পারব কিন্তু প্রথমেই ক্যানসার বা কার্ডিও-ভাসকুলার চিকিৎসাকে আনতে পারব না। কিন্তু ওড়িশার গ্রামে কাউকে সাপে কাটলে তার জন্য যদি ভেন্টিলেটর বা ডায়ালিসিসের ব্যবস্থা করতে হয়, সেটাকে কিন্তু 'টারশিয়ারি কেয়ার' বলে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। সেটার বন্দোবস্ত করতে হবে। ক্যানসার বা কার্ডিওভাসকুলার চিকিৎসাকেও আনতে হবে, দেরিতে হলেও। আপাতত সেই খরচটা বহন করার জন্য বিমার উপর নির্ভরশীল হতে হবে। গরিব মানুষের ক্ষেত্রে এই ধরনের জটিল রোগ ও তার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করার জন্য সরকারকে ভর্তুকির বন্দোবস্ত করতে হবে। এইটি একটি দৃষ্টিভঙ্গিরও ব্যাপার। সার্বিক স্বাস্থ্যের মধ্যে কোন কোন রোগকে গুরুত্ব দেওয়া হবে, তা তো এলাকার প্রয়োজন দিয়েই নির্ধারিত হতে হবে। ধরা যাক, বিহারের ক্ষেত্রে ধরুন কালাজ্বরকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হল, আবার কেরলের ক্ষেত্রে অন্য কিছু। কিন্তু মৌলিক পরিকাঠামোটি এক হতে হবে।

প্রশিক্ষিত গ্রামীণ চিকিৎসকদের (সরকার-অননুমোদিত) প্রসঙ্গে তাঁর ধারণা অনেকেই নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দেন। তাঁর ব্যক্তিগত মত, সমাজে যা মানব সম্পদের পুরোটাই ঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত। যদি গ্রামীণ চিকিৎসকদের ঠিকঠাক প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় এবং স্ট্যান্ডার্ড ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইনটি দেওয়া যায়, তাহলে তাঁদের ব্যবহার করা যেতেই পারে। কিন্তু হাতুড়ে চিকিৎসা একেবারেই চলবে না।

প্রয়োজনের তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা খুবই কম। বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে যারা বিশাল অঙ্কের ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে ডাক্তারি পড়ছে তারা কি আদৌ সরকারি হাসপাতালে বা গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা করতে আগ্রহী হবে?— এসব প্রসঙ্গে ডা. রেড্ডির অভিমত:

''যে জেলাগুলিতে মেডিক্যাল কলেজ নেই, সেখানে জেলা হাসপাতালগুলিকে মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। নার্সিং কলেজগুলিকেও। প্রতিটি জেলায় সেটি করা সম্ভব না হলেও কয়েকটি জেলা নিয়ে একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেখানে স্থানীয় পড়ুয়াদের জন্য অন্তত ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করতে হবে। সরকার তাদের পড়ার ব্যয় বহন করবে। তারপর অন্তত পাঁচ বছর ওই জায়গায় কাজ করা তাঁদের জন্য বাধ্যতামূলক করতে হবে।'' স্বাস্থ্যের বৃত্তে

এ-দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার হালহকিকত প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেন

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় অমর্ত্য সেনের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারে তিনি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা প্রসঙ্গে নানা আলোচনা করেছেন। আমরা তা থেকে কিছু নির্বাচিত অংশ *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পাঠকদের কাছে পেশ করছি।

ব্রাজিলে স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেন বলেন: ব্রাজিলে বহু দশক ধরে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি অসাম্য ছিল। ওরা সেটা অনেকখানি কমিয়েছে, তার পিছনে সরকারি পরিকল্পনার বড়ো ভূমিকা ছিল। মেক্সিকোতে সকলের জন্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা হয়েছে, ফলে সাধারণ অসুখবিসুখে মানুষ চিকিৎসা পাচ্ছে না, এটা আর হয় না, আমাদের দেশে যেটা সারাক্ষণ হচ্ছে। ওরা আরও কিছু জিনিস করতে পেরেছে। যেমন, ব্যবসায়ীদেরও ওরা এই কাজে অনেকটা জড়িয়ে নিতে পেরেছে। আমাদের অনেকগুলো সমস্যা। প্রথমত, আমাদের আয় কম। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশের ব্যাবসায়িক সংস্থাগুলো সচরাচর এ বিষয়ে নজর দিতে একেবারেই উৎসাহী নয়। তৃতীয়ত, সরকার তাদের উপর কখনোই এই বলে চাপ দিচ্ছেন না যে, দেশের কল্যাণের জন্য এটা করো। সরকারের যথেষ্ট উদ্যোগ ছাড়া সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা কোনো দেশে সম্ভব হয়নি। ঠিক যেমন সরকারের সাহায্য ছাড়া সকলকে সাক্ষর করে তোলা গেছে, এটাও কোথাও হয়নি। একমাত্র ভারতবর্ষেই সরকার এমন একটা অসম্ভব জিনিসকে সম্ভব মনে করে ভুল পথে এগিয়ে যাবেন, এ-রকমটা মনস্থ করেছেন।

অসাম্য নিয়ে চর্চা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য: অসাম্য নিয়ে চর্চা এখন সত্যিই অনেকটা হচ্ছে। টমাস পিকেটির ক্যাপিটাল যেমন খুব সুন্দর বই। কিন্তু এখানে প্রধানত আয় ও সম্পদের বৈষম্যের আলোচনা করা হয়েছে, সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে একেবারে ওপরতলার ধনীদের হাতে সম্পদ ও আয় কীভাবে পুঞ্জীভুত হচ্ছে তার ওপর। সেটাও খুব দরকারি আলোচনা, কিন্তু ভারতে প্রধান সমস্যাটা হচ্ছে, জনপরিষেবার অবস্থা খুব খারাপ, ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সামাজিক নিরাপত্তার মতো ব্যাপারগুলোতে খুব বড়ো রকম অনৈক্য থেকে গেছে। পিকেটি যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন, এ দেশে কেবল আয়ের বৈষম্যের দিকে নজর দিলে চলবে না, জনপরিষেবার ঘাটতির দিকেও নজর দিতে হবে।

আমাদের দেশের নীতি রচনায় সুপরিকল্পনার অভাব আছে। যেমন বলা হচ্ছে, ওষুধের দাম কমানো হবে। সেটা ভালো, কিন্তু যাতে যথেষ্ট ভালো ডাক্তার থাকেন, চিকিৎসা ঠিক ভাবে হয়, সে দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে না। আনতাবড়ি ওষুধের প্রয়োগ বাড়ার ফলে টাকা খরচ বাড়ছে, কিন্তু স্বস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে এটা বলা যাবে না।

বিশেষ করে গ্রামে ডাক্তারের ভয়ানক অভাব। এটা একটা বড়ো সমস্যা। তাইল্যান্ডে এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য নিয়ম করেছে, ডাক্তারি পাশ করার পরে দুই বা তিন বছরে গ্রামে চিকিৎসার কাজ করতে হবে।

না করলে কী হয়?

একটা শাস্তির ব্যবস্থা হয় বলেই আমার ধারণা। মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশে ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের বিরাট বাজার। ওখানে কিন্তু সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাটাই প্রধান, ফলে ডাক্তাররা নিয়ম না মানলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সহজ। . . .

স্বাস্থ্য এবং শিক্ষায় আমাদের দেশে সরকারি খরচের বিরাট ঘাটতি। জাতীয় আয়ের খুব কম অংশই স্বাস্থ্যের জন্য বরাদ্দ হয়। আগের কংগ্রেস আমলেও সেটা কম ছিল, বিজেপি সরকার তা আরও কমিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, সরকারি পরিষেবার ব্যবস্থাপনা নিয়েও চিন্তাভাবনার খুবই অভাব। তাই সামান্য যে অর্থ ব্যয় হয়, সেটাও ভালো প্রয়োগের ব্যবস্থা হয় না। তার একটা কারণ, এই ধারণাটা এ দেশে জোরদার যে, বেসরকারি চিকিৎসাতেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এটা আগেও ছিল, এখন আরও বেড়ে গেছে।

দক্ষিণ ভারতে তো অন্য রকম দেখেছি আমরা, কেরলে, তামিলনাড়ুতে উত্তর ভারতেও হিমাচল প্রদেশে, এগুলো ভালো দৃষ্টান্ত। সরকারি জনপরিষেবা যে করা যায়, তার অনেক প্রমাণ দেওয়া যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সুচিন্তার অভাব আছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যায়। বিজেপির স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন হর্ষবর্ধন, যে মুহূর্তে একটু ঠিক ঠিক চিন্তার পরিচয় দিলেন এবং বললেন যে তামাক কোম্পানিগুলোকে দমন করবেন, অমনি তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল।

চিন্তা এবং ব্যবস্থাপনার এই অভাব ইদানীং আরও বেড়েছে। এক, বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার হাতে সব কিছু ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। দুই, সরকার যে সব খাতে খরচ করে, সেখানে সাধারণ মানুষের মৌলিক স্বাস্থ্যের চেয়েও জটিল যে সব চিকিৎসায় অনেক খরচ হয়, সেগুলোতে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। যেমন আরএসবিওয়াই (রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা)-এর মতো পরিকল্পনা, যার মূল ভাবনাতেই সমস্যা। প্রথমত, এই ব্যবস্থার জন্যে যে টাকা খরচ হচ্ছে, তা প্রাথমিক স্বাস্থ্যে দেওয়া হলে অস্বাস্থ্যের অনেক সমস্যা আসতই না। তা না করার ফলে অসুখের জটিলতা বেড়ে যায়, খরচও বেড়ে যায়। দ্বিতীয়ত, বিমার টাকাটা দেওয়া হবে হাসপাতালকে। এখন আমাদের দেশে মানুষ বেসরকারি হাসপাতালকে বেশি ভরসা করেন। ইউরোপে এটা ভাবাই যায় না। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আমাকে এক বার একটি চিকিৎসার ব্যাপারে ইংল্যান্ডের এক ডাক্তার বলেছিলেন, 'আপনার ব্যাপারটা যদি কম সিরিয়াস হত, তা হলে বলতাম আপনি বেসরকারি হাসপাতালে যেতে পারেন, কিন্তু এটা এতটাই সিরিয়াস যে কেবল ন্যাশনাল হেল্‌থ সার্ভিসই এটা দেখার ক্ষমতা রাখে।' আমাদের দেশে ঠিক উলটো। লোকের ধারণা হয়েছে যে, বড়ো বড়ো বেসরকারি নার্সিং হোমেই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। অথচ এমনটা তো হওয়ার কথা নয়, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলোকে সবচেয়ে ভরসা করা যাবে, এটাই তো হওয়ার কথা।

সমাজের মাথারা বড়ো বড়ো বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিং হোমে ছুটছেন চিকিৎসার জন্য; সরকারি হাসপাতাল ভালো পরিষেবা দেওয়ার জোর পাবে কোথা থেকে? যেমনটা স্কুলগুলোতেও হচ্ছে—এ প্রশ্নে অমর্ত্য সেন জানান: ঠিকই, তবে এখানে একটা পার্থক্য আছে। যাঁরা স্কুল-কলেজে

ছেলেমেয়েদের পাঠান, তাঁদের অনেকেই অন্তত স্কুল সম্বন্ধে কিছুটা জানেন। কিন্তু চিকিৎসার ক্ষেত্রে—যেটাকে অ্যাসিমেট্রিক ইনফর্মেশন বলা হয়—যা জানার চিকিৎসকরা তা হয়তো জানেন, কিন্তু রোগী বা তাঁর বাড়ির লোক কেউই বিশেষ কিছু জানেন না। ফলে বড়ো বড়ো বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিং হোমেও যে সব সময় ভালো চিকিৎসা হয়, তা বলা যাবে না। তবুও যাঁদের সামর্থ্য আছে, সরকারি হাসপাতালের কথা তাঁরা ভাবেন না, কারণ সেখানে খুবই অব্যবস্থা। আমাদের কম বয়সে এটা ভাবা হত না, ভাবার কোনো কারণও ছিল না।

সাধারণভাবে, ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে তিনটে কথা বলার। এক, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যাকে অবহেলা করে বড়ো বড়ো হাসপাতাল নার্সিং হোম তৈরি করা, বড়ো বড়ো অসুখের চিকিৎসার দিকে বেশি মনোযোগ করা। বেশির ভাগ গরিব মানুষ তো ওই পর্যায়ে পৌঁছনোর আগেই খতম হয়ে যান। প্রাথমিক স্বাস্থ্যের দিকে ভালো করে নজর না দিলে স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুব্যবস্থা কোথাওই করা সম্ভব নয়। দুই, এই ব্যবস্থায় চিকিৎসার টাকাগুলো যায় প্রধানত বেসরকারি হাসপাতালে। এখানে একটা স্বার্থগোষ্ঠী তৈরি হয়ে গেছে, যাদের বড়ো রকমের প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। তিন, অনেক সময় বেসরকারি হাসপাতালে অকারণ চিকিৎসা করিয়ে দেয়, কারণ সেখানে তদারকি করার কেউ নেই। যেমন অনেক হাসপাতালে টাকার জন্যে মেয়েদের হিস্টেরেকটমি করিয়ে দেয়, প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক।

চিকিৎসার গোটা ব্যবস্থাটা হওয়া দরকার সামগ্রিক মাপকাঠি মেনে, চিকিৎসকদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে, একটা সুপ্রতিষ্ঠিত মানকে লক্ষ্য হিসাবে স্থির করে। তার পরে যদি ধনীদের জন্য বেশি মূল্য নিয়ে কিছু বাড়তি সুবিধের ব্যবস্থা করা হয়, সেটা চলতে পারে। কিন্তু বুনিয়াদি ব্যবস্থাটা হবে পাকা রকমের, এবং সেটা চালানোর দায়িত্বে থাকবেন যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য মেডিক্যাল অফিসাররা, যেভাবে হোক টাকা করাটাই যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। ১৯৫৪ সালে যখন প্রথম ইটালি গেলাম, তখন দেখেছি, ওদের চিকিৎসার ব্যবস্থা বেশ দুর্বল। এখন তো ইটালিতে স্বাস্থ্য পরিচর্যার চমৎকার আয়োজন। সেটা ওই নির্ধারিত চিকিৎসক এবং নার্সদের সাহায্যেই তৈরি করা হয়েছে। আর একটা কথা হচ্ছে, আমাদের নার্সিংয়ের মান প্রচণ্ড খারাপ।

প্রশিক্ষণের অভাব . . . তো আছেই, জনকল্যাণের কাজে যে মানসিকতাটা দরকার, অনেক সময় তারও অভাব দেখা যায়। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সাধারণভাবে ব্যবস্থাটা একেবারেই সন্তোষজনক নয়। চিকিৎসার সঙ্গে অর্থ আহরণ করাটা অতিমাত্রায় জড়িত হয়ে গেছে।

সমাজ এবং রাষ্ট্র দু-দিক থেকেই একটা সমদৃষ্টির অভাব আছে। ভীষণ রকম অভাব আছে। এইটেই কিন্তু মোদ্দা কথা। রাষ্ট্র এবং সমাজ, দুটোর মধ্যেই এই সমদৃষ্টির অভাব দূর করতে হলে একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন দরকার। প্রথমত, স্বাস্থ্যের জন্য টাকা বেশি বরাদ্দ করা দরকার। দ্বিতীয়ত, সেই টাকাগুলা আরএসবিওয়াই ইত্যাদি ভুল খাতে না ঢেলে সুচিন্তিতভাবে ব্যয় করা দরকার। তৃতীয়ত, স্বাস্থ্য পরিচর্যার কাজে যাঁরা যুক্ত তাদের মানসিকতার একটা পরিবর্তন খুবই জরুরি। আমাদের সব কিছুই একটা ব্যাবসায়িক সমাজের মতো হয়ে গেছে, কে কোথা থেকে টাকা করতে পারে সেটাই একমাত্র বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য কোনো কমিটমেন্ট যে থাকত পারে, সেই উপলব্ধি একেবারে কমে গেছে।

সামাজিক আন্দোলনের একটা ভূমিকা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে একটা সুচিন্তার খুব বড়ো রকমের প্রয়োজন আছে।

কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল, তার মধ্যে একটা সুচিন্তিত পার্থক্য করা দরকার। আমাদের আন্দোলনে অনেক সময় ভালো মন্দ এমন একসঙ্গে চলে যে, তাতে হিতে বিপরীত হয়।

অর্থনীতিতে অলৌকিক চিন্তার অভাব নেই। সেটা প্রধানত দক্ষিণপন্থীদের থেকেই আসে। যেমন ওই যে বলছিলাম, চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থাই যেখানে নেই, রোগীরা জানেন না কী অসুখে তাঁরা ভুগছেন, সেখানে বেসরকারি ব্যবসায়ী লাভ করতে নেমে তাঁদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন, এটা অলৌকিক চিন্তা। পৃথিবীর কোথাও এমনটা হয়নি এবং পৃথিবীর বাইরেও কোথাও হয়েছে বলে আমি শুনিনি অতএব একেবারেই অলৌকিক বলতে হবে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য সামাজিক নিরাপত্তার প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি পূরণ করার ক্ষেত্রে চীনের অবস্থা আমাদের থেকে অনেক ভালো।

প্রশ্ন হল, আমরা কি গণতন্ত্র রেখেও এই সব বিষয়ে চীনের সমকক্ষ হতে পারি? এর উত্তর হচ্ছে, কেন পারব না? এটা ঠিকই যে, ওদের পক্ষে

চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থাই যেখানে নেই, রোগীরা জানেন না কী অসুখে তাঁরা ভুগছেন, সেখানে বেসরকারি ব্যবসায়ী লাভ করতে নেমে তাঁদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন, এটা অলৌকিক চিন্তা। পৃথিবীর কোথাও এমনটা হয়নি ।

খুব সজোরে সবেগে একটা কাজ করা সম্ভব। যদি ওপরের দিকে বারো জন বা চোদ্দো জন কোনো বিষয়ে একমত হলেন, তা হলেই সেটা তাঁরা করতে পারেন। কিন্তু আমাদের এখানে এগুলো করতে গেলে অনেক সময়েই একটা জন-আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। খবরের কাগজগুলোর, টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর একটা ভূমিকা আছে। এবং তার সঙ্গে এটা স্বীকার করার প্রয়োজন আছে যে, আমরা যদি এই জিনিসগুলো না চাই তা হলে পাব না। এই চেষ্টাগুলো করলে আমরা গণতন্ত্রের সত্যিই সুযোগ নিতে পারি।

এমন যে হয়নি তা নয়। ব্রাজিল নিয়ে কথা হচ্ছিল। ব্রাজিলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির যে উন্নতি এল, সেগুলো কী করে এল? গণতন্ত্রের সাহায্যেই তো এল। সামরিক শাসন চলে যাওয়ার পরে লোকে ভীষণরকম প্রতিবাদ করলেন যে, কেন দেশে এ রকম অসাম্য আছে, কেন আমাদের সবার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, কেন আমাদের শিক্ষার মান এত খারাপ। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সমস্যাগুলোর অনেকটা সুরাহা হল। সেটা তো গণতন্ত্রের অভাবে এল না, তার সাহায্যেই এল। আমাদেরও ঠিক সেটাই করা দরকার। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লাতিন আমেরিকার স্বাস্থ্য আন্দোলন—দুই ডাক্তারের গল্প

সত্য শিবরমণ

সবার জন্য স্বাস্থ্য পেতে গেলে বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন কি অপরিহার্য? এ বিষয়ে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' (২৪ জানুয়ারি ২০১৬) কনভেনশনে স্বাস্থ্য গবেষক সত্য শিবরমণের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পাঠকদের সামনে রাখা হল।

চিত্র ১. সালভাদোর আলেন্দে

আমাকে লাতিন আমেরিকার স্বাস্থ্য আন্দোলনের সম্পর্কে দু-চারকথা বলতে বলা হয়েছে। বিগত দশকে আমি বেশ কয়েকবার সেখানে গেছি। সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে আমার খুব অনুপুঙ্খ জ্ঞান আছে এমন দাবি আমি করব না। তবু সেখানে আমার বন্ধু মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে যেটুকু সাধারণ ধারণা হয়েছে সে ধারণাটুকু দেবার চেষ্টা করব।

প্রেক্ষাপট

৬২.৬ কোটি মানুষের বাসভূমি কুড়িটি দেশ নিয়ে লাতিন আমেরিকা হল এক বিশাল ভূমি, আয়তনে ১৯০ লক্ষ বর্গমাইল, পৃথিবীর মোট ভূমির মোটামুটি শতকরা ১৭ ভাগ। সব দেশ মিলিয়ে লাতিন আমেরিকাতে জিডিপি (Gross Domestic Product—সেই অঞ্চলে এক বছরে তৈরি সব দ্রব্য ও পরিষেবার মোট দাম) হল ৫৫০০০ ট্রিলিয়ন ডলার। স্প্যানিশ আর পোর্তুগিজ হল এখানকার মূল ভাষা, কিন্তু এখানে আরও বহু ভাষাগোষ্ঠী আছে, আছে নানান ধরনের নানা বংশোদ্ভূত মানুষ।

যেকোনো দেশে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো বুঝতে গেলে প্রথমেই বুঝতে হবে, ডাক্তার হাসপাতাল-ওষুধ—এগুলো পাওয়া যাচ্ছে কিনা কেবল তার ওপর স্বাস্থ্য নির্ভর করে না। লাতিন আমেরিকাতে এটা আরও ভালো বোঝা যায়। স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ব্যাপার মানে পুষ্টি, নির্মল বায়ু, সুপেয় জল, কর্মস্থানে নিরাপত্তা, মারামারির অবসান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি। এগুলো সবই মানুষের দেহ আর তার ভালোভাবে কাজ করতে অপরিহার্য।

স্বাস্থ্যের এই বৃহত্তর ধারণাটি সঠিক। লাতিন আমেরিকা তার নাগরিকদের ভালোমন্দ বিষয়ে এক দুঃস্বপ্ন ছিল। সেটা আজকের ব্যাপার নয়, সেই পাঁচশো বছর আগে যখন ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনকারীরা আমেরিকা মহাদেশে প্রথম এসেছিল, তখন থেকেই এই ব্যাপারে লাতিন আমেরিকা খুব খারাপ অবস্থায়।

উরুগুয়ের প্রয়াত লেখক এদুয়ার্দো গ্যালেনো লাতিন আমেরিকাকে 'খোলা রক্তনালী' বলেছিলেন; এখান থেকে যথেচ্ছভাবে শত-শত বছর ধরে 'পুষ্টি' বা সম্পদ শোষণ করে নেওয়া হত। প্রথমে নিত ইউরোপীয় উপনিবেশকারীরা, তারপর নিত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদীরা। আর স্থানীয়দের পাওনা ছিল মৃত্যু ও ধ্বংস।

ঐতিহাসিকভাবে, বর্তমান লাতিন আমেরিকা যেখানে সেটা ছিল স্থানীয় জনজাতির মানুষের মূল ভূমি। ইউরোপীয়রা এসে তাদের ধ্বংস না করা পর্যন্ত বহুযুগ এভাবেই কেটেছিল। ১৪৯২-এ কলম্বাস আসার আগে মূলবাসী আমেরিকানদের সংখ্যা ঠিক জানা নেই, সেটা পাঁচ কোটি থেকে ১৯ কোটি হবে। সপ্তদশ শতকের শেষে (১৬৯০-এর দশক নাগাদ) তাদের শতকরা ৯০ ভাগ নানা রোগে বা ইউরোপীয় উপনিবেশিকদের সঙ্গে লড়াইতে মারা পড়ল। এখন যেটা ব্রাজিল, সেখানে মোটামুটি ৪০ লক্ষ মূলবাসী বিংশ শতকের শেষে দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষে। আজকের লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ মানুষ হলেন ইউরোপীয়, মূলবাসী আর দাস হিসেবে আফ্রিকা থেকে আনা কালো মানুষদের সংমিশ্রণ-জাত।

ভারত ও লাতিন আমেরিকার সমস্যা

ভারতীয়দের জন্য এই ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, আমার মনে হয়, যে উপনিবেশ স্থাপন লাতিন আমেরিকাতে ৫০০ বছর ধরে চলেছে, আমাদের দেশে সেটাই চলেছে ৫০০০ বা তারও বেশি বছর ধরে, আর সেটা হয়েছে নিয়মিত আগন্তুক, আক্রমণকারী ও বসতি-স্থাপনকারীদের মাধ্যমে। সামাজিক স্তরবিন্যাস আর ক্ষমতার উচ্চনীচ ভাগ—এসবের পদ্ধতিও দুই জায়গায় খুব কাছাকাছি ধরনের। মূল তফাত হল এই ঘটনা ঘটার সময়ের কালপর্বে বিরাট ফারাক। আমরা কলম্বাসের নাম জানি, কিন্তু ভারতে কে প্রথম বাইরে থেকে এসে উপনিবেশ বানিয়েছিল তা জানি না। অবশ্য কেউ কেউ প্রস্তাব করেন রামচন্দ্রই হলেন ভারতে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনকারী, কেননা তিনিই প্রথম আর্যরাজা যিনি বর্তমান উত্তরপ্রদেশ থেকে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত উপনিবেশ গড়েছিলেন। কিন্তু সে বিতর্কে যাবার স্থান এটা নয়।

সোনা, রুপো, তামা, টিন, কাঠ, অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক, বক্সাইট, অজস্র কৃষিদ্রব্য—লাতিন আমেরিকা ইউরোপীয় উপনিবেশিকদের বিরাট সম্পদের উৎস হয়ে রইল বহু শতক জুড়ে; শেষে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে তাদের তাড়ানো সম্ভব হল। ইউরোপের ফরাসি বিপ্লব আর হাইতি-তে কালো মানুষের সফল স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে লাতিন আমেরিকার স্বাধীনতা- সংগ্রামীরা তাঁদের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে এক ধরনের গণতন্ত্র এল, যদিও ক্ষমতা সাদা চামড়ার মানুষদের বংশধরদের হাতেই মূলত রইল, আর তারাই ছিল ওখানে বড়ো জমি- মালিকও।

চিত্র ২. চে গেভারা

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করে নিজেই খুব ধনী আর শক্তিশালী হয়ে উঠল। তারা নিজেদের বড়ো কর্পোরেশনগুলোর ব্যাবসায়িক সুবিধা করে দেবার জন্য লাতিন আমেরিকার নানা দেশের গণতান্ত্রিক শাসনকে আড়াল থেকে ধ্বংস করে দিল। 'ব্যানানা রিপাবলিক' নামক কুখ্যাত নামটি এই সময়েই চালু হয়—যখন আমেরিকার কলা রপ্তানিকারী কোম্পানিগুলো নিজেদের সুবিধার জন্য লাতিন আমেরিকার নানা দেশের সরকারগুলোকে ইচ্ছেমতো বদলে দিত।

এসব সত্ত্বেও লাতিন আমেরিকার দেশগুলো বিংশ শতকের শুরু থেকেই জনকল্যাণ নিয়ে বিশাল সামাজিক পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করে। যখন ইউরোপ দুটো বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তখন উরুগুয়ে, চিলে, আর্জেন্তিনা সরকারি অর্থে জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা, জনসাক্ষরতা প্রকল্প, বেকার ভাতা আর শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম বেতন—এসবের ব্যবস্থা করে।

বিগত শতকের ছয়ের দশক আর সাতের দশকে বিশ্ব জুড়ে ঠান্ডাযুদ্ধের চূড়ান্ত অবস্থায় মার্কিনদেশের চাপে পড়ে লাতিন আমেরিকান দেশগুলো একগুচ্ছ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নেবার পরীক্ষায় গিনিপিগ হতে বাধ্য হয়—যা 'নিও-লিবারেলিজম' নীতি নামে কুখ্যাত। এই নীতি অনুসারে রাষ্ট্র হাত গুটিয়ে নিল, আর স্বাস্থ্য-শিক্ষা পরিকাঠামো নির্মাণ এসবকে ছেড়ে দেওয়া হল প্রাইভেট হাতে। এক অর্থে সরকারগুলো পর্যন্ত যেন 'প্রাইভেট' হয়ে গেল—গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারগুলোকে উলটে দিয়ে ডিক্টেটররা ক্ষমতায় বসলেন আর সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকারগুলোকে নিষ্ঠুরভাবে দলিত করা হল।

এখনও দারিদ্র্য এই অঞ্চলের মূল চ্যালেঞ্জ। রাষ্ট্রসংঘের কথায়, লাতিন আমেরিকায় পৃথিবীর সম্পদ-অসাম্য সবচেয়ে বেশি। বিশ্বব্যাঙ্কের সমীক্ষা অনুসারে, লাতিন আমেরিকার সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ সেখানকার মোট উপার্জনের শতকরা ৪৮ ভাগের অধিকারী, আর দরিদ্রতম ১০ শতাংশ মাত্র ১.৬ শতাংশ উপার্জন করে।

অসাম্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে, বাড়ছে। ভারতের মতোই লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সামাজিকভাবে দুর্বলতার অংশগুলোর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বও কম, ফলে তারা দেশের নীতিগুলো নিজেদের স্বার্থ অনুসারে নির্ধারণ করতে পারে না। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক লিবারেলাইজেশন অসাম্য বাড়িয়েছে।

স্বাস্থ্য-আন্দোলন, সামাজিক ন্যায়, রাজনৈতিক পরিবর্তন

এই প্রেক্ষাপটে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই, লাতিন আমেরিকার সত্যিকারের স্বাস্থ্য-আন্দোলন সবসময়েই সামাজিক ন্যায়ের ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের দাবিতেই হয়েছে, যাতে দরিদ্র আর প্রান্তিক মানুষের ন্যূনতম অধিকারের দাবি মেটে। এমনিতে ডাক্তারদের রাজনীতিবিদ হতে হবে তেমন কথা নেই, কিন্তু লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে মৌলিক রাজনৈতিক পরিবর্তনে দু-জন বিখ্যাত ডাক্তারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য—কিন্তু এই দু-জনেই আলাদা আলাদা ধরনের রাজনৈতিক পদ্ধতি নিয়েছিলেন।

এই দুই 'ডাক্তার'এর একজন ডাক্তার হলেন সালভাদর আলেন্দে। ডাক্তার ও সমাজবাদী রাজনীতিবিদ আলেন্দে ১৯৭০ সালে চিলে-র প্রথম বামপন্থী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। দেশের অর্থনীতিতে তিনি ব্যাপকহারে জাতীয়করণ ও সমবায় চালু করেন; ফলে তাঁকে মেরে ফেলা হয়, এবং সিয়া (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থা CIA)-র সহায়তায় একটি সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে ১৯৭৩ সালে চিলে-তে এক সামরিক সরকার ক্ষমতায় বসে। আলেন্দে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিশ্বাসী ছিলেন। আর তার মাধ্যমেই চিলে-র জনগণের পক্ষে ক্ষতিকর সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতিগুলো বদলাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর 'শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন' ঘটানোর চেষ্টা দক্ষিণপন্থীদের উলঙ্গ হিংস্রতার শিকার হল। এটা শান্তিপূর্ণ পথে, বলপ্রয়োগ ছাড়া পরিবর্তন আনার ধারণায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

তা সত্ত্বেও, আলেন্দের ঐতিহ্যের মৃত্যু হয়নি। গত দু-দশক ধরে এই অঞ্চলের একের পর এক দেশ বামপন্থী বা পপুলিস্ট নানা নির্বাচিত সরকার গঠিত হয়েছে। আলেন্দের স্বাস্থ্যনীতির কিছু কিছু, যেমন সরকারি খরচে স্বাস্থ্যপরিষেবা, সকল মানুষকে পরিষেবার আওতায় আনা, পরিষেবায় মানুষের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার, সম্পদ পুনর্বণ্টনের সামাজিক নীতি—এগুলো অনেক লাতিন আমেরিকান দেশে স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

অন্য যে 'ডাক্তার' লাতিন আমেরিকার স্বাস্থ্য-আন্দোলন খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি আর কেউ না, বিখ্যাত চে গেভারা। তিনি ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে ১৯৫৪ সালে কিউবার সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন, আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নাকের ডগায় এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তৈরি করেন। কিউবা ছিল কয়েকজনের 'রাজত্ব', দারিদ্র্য আর অসাম্যে ভরা। এখন কিউবার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্ত সূচক অনেক উন্নত দেশের সঙ্গেই তুলনীয়।

কিউবার কথা

কিউবার টিকাকরণ হার পৃথিবীতে সবচাইতে বেশির মধ্যে পড়ে। জন্মের সময় একজন কিউবার নাগরিকের সম্ভাব্য আয়ু ৭৮ বছর, অনেক ধনী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমান। ১৯৫০-এর দশকে কিউবাতে শিশুমৃত্যুর হার ছিল ১০০০ জন্মপিছু ৮০ জন; এখন সেটা নেমে দাঁড়িয়েছে ৫ জনে, যেটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চাইতে কম।

সন্দেহ নেই যে স্বাস্থ্যের এই উন্নতি পুষ্টি আর শিক্ষার উন্নতির জন্যই হতে পেরেছে; এর ফলে স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারকগুলো বদলে গেছে। কিউবার সাক্ষরতা হার শতকরা ৯৯ ভাগ, আর স্কুলে স্বাস্থ্যশিক্ষা আবশ্যিক। গত চার দশকে যে রোগ প্রতিরোধ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য-পরিষেবার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তার ফলেও দেশের স্বাস্থ্য সূচকগুলোর ব্যাপক উন্নতি হয়েছে।

কিউবার মেডিক্যাল শিক্ষার অভিনব দিকটি হল যে রোগীকে তাঁর কম্যুনিটির মধ্যে একজন হিসেবেই ভাবা হয়। কিউবার মানুষ চিকিৎসা-পরিষেবা পান পারিবারিক চিকিৎসকদের এক বিরাট নেটওয়ার্ক থেকে। পারিবারিক চিকিৎসকরা কম্যুনিটির স্বাস্থ্যের খবর রাখেন নিয়মিত চেক-আপ, ফলো-আপ ও অন্যান্য চিকিৎসা-পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে ও নিয়মিত বাড়িতে গিয়ে রোগী দেখে।

কিউবার স্বাস্থ্যব্যবস্থার অসাধারণ ব্যাপারটা হল যে মেডিক্যাল শিক্ষায় সকল নাগরিকের জন্য খোলা দরজা, আর এই শিক্ষা বিনামূল্যে পাওয়া যায়। মাথাপিছু চিকিৎসকের সংখ্যা কিউবাতে মার্কিন দেশের দ্বিগুণ। এরকম অনেক চিকিৎসক বিদেশে কাজ করেন। ২০০৮ সালে ৩৭,০০০ স্বাস্থ্যদানকারী (মূলত চিকিৎসক ও নার্স) কিউবা থেকে অন্য ৭০টি দেশে গিয়ে পরিষেবা দিয়েছেন।

কিউবার মেডিক্যাল শিক্ষার অভিনব দিকটি হল যে রোগীকে তাঁর কম্যুনিটির মধ্যে একজন হিসেবেই ভাবা হয়। কিউবার মানুষ চিকিৎসা-পরিষেবা পান পারিবারিক চিকিৎসকদের এক বিরাট নেটওয়ার্ক থেকে। পারিবারিক চিকিৎসকরা কম্যুনিটির স্বাস্থ্যের খবর রাখেন নিয়মিত চেক-আপ, ফলো-আপ ও অন্যান্য চিকিৎসা-পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে ও নিয়মিত বাড়িতে গিয়ে রোগী দেখে। এই পারিবারিক চিকিৎসকদের সমাজবিজ্ঞানী (sociologists), সামাজিক মারীবিদ (social epidemiologists), এবং সমাজকর্মী (social workers)—এর সবকিছুই বলা হয়।

পারিবারিক চিকিৎসকেরা যাকে দেখতে যান তাঁর আশপাশের অবস্থা পরিদর্শন করেন আর স্থানীয় যে সব ব্যাপার রোগের পারিপার্শ্বিক হিসেবে কাজ করে, রোগের ঝুঁকি বাড়ায়, সে সবই দেখেন। যেমন জঞ্জাল জমা, পরিবেশের দূষণ, কিংবা মশা—অর্থাৎ যা কিছু স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে, সবই দেখা হয়। তা ছাড়াও বাড়ির অন্য মানুষজন কারা, তাঁরা কেমন আছেন, তাঁদের সম্পর্ক কেমন—এ সবই চিকিৎসকেরা দেখেন।

ভেনেজুয়েলার অধুনা-প্রয়াত প্রেসিডেন্ট উগো চ্যাভেজ ভেনেজুয়েলার স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করতে গিয়ে কিউবার মূলনীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন, আর কিউবার স্বাস্থ্য পেশায় নিযুক্ত মানুষদের সাহায্য নিয়ে ক্যারাকাস-এ গরিবদের জন্য কম্যুনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবা তৈরি করেছিলেন। এক্সপার্টদের মতে, কিউবান ধাঁচাটা সারা বিশ্বের সব উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাঁচা।

১৯৫৭ থেকে ২০০৭ এই কালপর্বে কিউবার সামাজিক সূচকগুলোর পরিবর্তন

সূচক	১৯৫৭ সাল	২০০৭ সাল	শতকরা পরিবর্তন
বেকারি	১৬.৪%	১.৯%	-৮৮
বয়স্ক সাক্ষরতা	৭৬.৪%	৯৭.৯%	২৮
উচ্চশিক্ষারত মানুষ	৪%	৮৮%	২১০০
শিশুমৃত্যু হার (প্রতি একহাজার জীবন্ত জন্মপিছু)	৩৩.৪%	৫.৩	-৮৪
মাতৃমৃত্যু হার (প্রতি দশহাজার জীবন্ত জন্মপিছু)	১২৫.৩	৪৯.৪	-৬১
চিকিৎসক সংখ্যা	৯.২	৬৪.০	৫৯৫

একমাত্র মুশকিল হল যে ফিদেল কাস্ত্রো আর চে গেভারা বিশ্বে খুব বেশি হয় না, আর আমরা চাই বা না চাই, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কিউবার মডেল অনুসরণ করার আগে দেশের রাজনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দরকার।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

সত্য শিবরমণ, স্বাস্থ্য গবেষক।

১৯৭৯-র ডিসেম্বরে দল্লিরাজহরার ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকাদের অবহেলায় প্রাণ হারান লোহা-খনির ঠিকাদারি শ্রমিক কুসুমবাই। প্রসূতি কুসুমবাই ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘের উপাধ্যক্ষা ছিলেন। কুসুমবাইয়ের মৃত্যুতে শ্রমিকরা শপথ নেন নিজেদের এক মাতৃসদন গড়ে তোলার। শেষে মাতৃসদন নয়, গড়ে ওঠে শহীদ হাসপাতাল। আর এক বিশাল জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।

কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

ঠিক ৩৩ বছর পর ২০১২-র ২ ডিসেম্বর চিকিৎসকদের অবহেলায় প্রাণ যায় সাংবাদিক সন্দীপ্তা চ্যাটার্জীর। ‘‘সন্দীপ্তাকে মনে রেখে’’ মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতার এক প্রয়াস।

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তা যেন এক সূত্রে বাঁধা। তাই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে ‘‘মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন’’।

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

সমস্যার নাম বন্ধ্যাত্ব

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

যেকোনো স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ প্রতিদিন যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হন তার মধ্যে একটা হল বন্ধ্যাত্ব বা infertility। সমস্যাটার মাত্রা কিন্তু কম নয়, প্রায় সব দেশেই প্রায় ১০ শতাংশ দম্পতি বন্ধ্যাত্বের শিকার। বন্ধ্যাত্ব মেয়েদের কাছে অভিশাপের মতো, বাচ্চা না হওয়ায় তাঁদের আড়ালে বলা হয়, 'বাঁজা', 'আঁটকুড়ে' ইত্যাদি। নীচের আলোচনায় জানা যাবে পুরুষ বা মহিলা কোনো একজনের বা উভয়ের সমস্যা থাকার জন্য ঘটে বন্ধ্যাত্ব। কিন্তু আমাদের দেশে এইজন্য কেবলমাত্র মহিলাকেই দোষারোপ করা হয়। বন্ধ্যাত্বের জন্য মানসিক সমস্যায় ভোগেন অনেক মহিলা, অনেককে বিবাহ বিচ্ছেদ বা সতীন নিয়ে ঘর করতে হয়। বাচ্চা হওয়ার আশায় এক ডাক্তার থেকে অন্য ডাক্তারের দোরে ঘুরে বেড়ানো—বারবার একই পরীক্ষানিরীক্ষা করানো, অনেকক্ষেত্রেই পরীক্ষানিরীক্ষায় কোনো অস্বাভাবিকতা মেলে না।

বন্ধ্যাত্ব নিয়ে জানা দরকার। কেননা এই বিষয়ে অনেক ভুল ধারণা আমাদের মনে গেঁড়ে বসে আছে।

বন্ধ্যাত্ব কাকে বলে?

এক বছর ধরে প্রয়াস চালানো সত্ত্বেও যদি স্ত্রী গর্ভবতী না হন তা হলে বন্ধ্যাত্ব আছে বলা হয়। স্ত্রীর বয়স ৩৫ বছর বা ৩৫ বছরের বেশি হলে ৬ মাস প্রয়াসের পরই বন্ধ্যাত্ব ধরে নিয়ে চিকিৎসা করা হয়। কোনো মহিলা হয়তো গর্ভবতী হচ্ছেন অথচ পুরো সময় গর্ভধারণ করে সন্তানের জন্ম দিতে পারছেন না, তাঁকেও বন্ধ্যা ধরা হয়।

আসলে গর্ভাবস্থার কয়েকটা ধাপ আছে। গর্ভবতী হতে গেলে

- মহিলার একদিকের ডিম্বাশয় (ovary) থেকে মাসে অন্তত একটা ডিম্বাণু বেরোতে হবে।
- সেই ডিম্বাণু ডিম্ববাহী নালী (fallopian tube) দিয়ে জরায়ুর দিকে যাবে।
- চলার পথে পুরুষের বীর্যের একটা শুক্রাণু সেই ডিমকে নিষিক্ত করবে।
- নিষিক্ত ডিম জরায়ুর ভেতরের দেওয়ালে বাসা বাঁধবে।

এই ধাপগুলোর যে কোনোটায় সমস্যার কারণে বন্ধ্যাত্ব হতে পারে।

বন্ধ্যাত্ব কেন হয়?

- বন্ধ্যা দম্পতিগুলোর ৩-৪ শতাংশের ক্ষেত্রে যৌনসংসর্গের প্রক্রিয়ায় কোনো সমস্যা থাকে। পুরুষের হয়তো লিঙ্গোত্থান ঠিকমতো হয় না, মহিলার হয়তো যৌনসংসর্গে এমন কষ্ট হয় যে পর্যাপ্ত যৌনসংসর্গ হয়ে ওঠে না। পর্যাপ্ত যৌনসংসর্গ না হওয়াও বন্ধ্যাত্বের কারণ হতে পারে। ডিম্ববাহী নালীতে ডিম্বাণু ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা নিষেকের উপযুক্ত থাকে আর ডিম্ববাহী নালীতে শুক্রাণু বেঁচে থাকে মোটামুটি ৭২ ঘণ্টা। তাই সপ্তাহে ৩ বারের কম যৌনসংসর্গ হলে গর্ভ সঞ্চারের সম্ভাবনা এমনিতেই কমে যায়।
- ৩০ শতাংশ ক্ষেত্রে শুক্রাণুর সংখ্যা কম থাকা, শুক্রাণু অনুপস্থিত থাকা, শুক্রাণুর চলনশীলতা কম থাকা বা শুক্রাণুর বিকৃতি বন্ধ্যাত্বের কারণ। বেশি মদ খাওয়া, ধূমপান, ড্রাগের নেশা, বেশি বয়স, কীটনাশক বা সিসার মতো পরিবেশের বিষ, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, ক্যান্সারের রশ্মি চিকিৎসা (radiotherapy) বা ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা (chemotherapy) -এসবের জন্যও এমনটা হতে পারে। অনেক সময় কোনো কোনো পুরুষের অণ্ডকোষের শিরাগুলো ফুলে থাকে, এই অবস্থাকে বলে ভেরিকোসিল (varicocele)। শিরা ফুলে থাকার জন্য অণ্ডকোষ গরম হয়ে থাকায় শুক্রাণুর সংখ্যা কমে যেতে পারে, বিকৃতি হতে পারে। এ ছাড়া হাম, কিডনির অসুখ, হরমোনজনিত অনেক রোগেও এমন হয়।

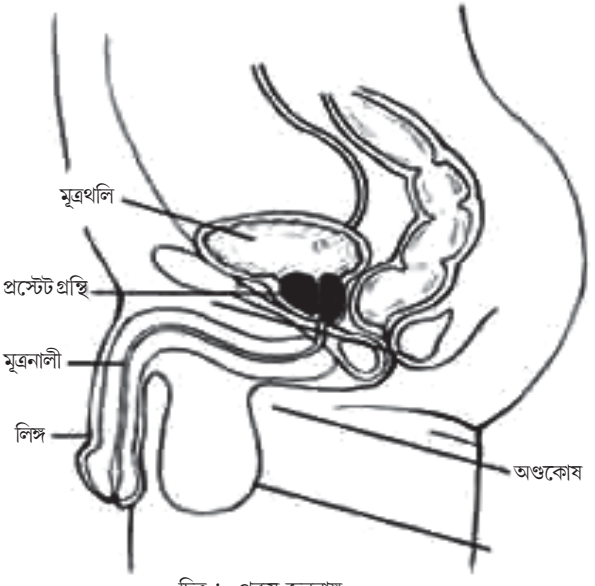

চিত্র ১. পুরুষ জননাঙ্গ

- ২০ থেকে ৩০ শতাংশ ক্ষেত্রে ডিম্ববাহী নালীর রোগে বন্ধ্যাত্ব হয়।
- ১০ থেকে ১৫ শতাংশ ক্ষেত্রে কারণ—এন্ডোমেট্রিয়োসিস (endometriosis) নামের এক অসুখ।
- ৫ শতাংশ ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্বের কারণ থাকে জরায়ুগ্রীবায় (cervix)। কারোর কারোর ক্ষেত্রে জরায়ুগ্রীবায় অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয় যা শুক্রাণুকে ধ্বংস করে ফেলে।
- কিছু মহিলার বন্ধ্যাত্বের কারণ ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু তৈরি না হওয়া বা ডিম্বাণু ডিম্বাশয়ের দেওয়াল ভেদ করে বের হতে না পারা, জরায়ুর ছোটো আকৃতি।
- অনেক দম্পতির ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্বের একাধিক কারণ একসঙ্গে থাকতে পারে।
- ৮ থেকে ১০ শতাংশ ক্ষেত্রে পুরো পরীক্ষানিরীক্ষা করেও কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

কীভাবে কারণ খোঁজা উচিত?

ইতিহাস নেওয়া শারীরিক পরীক্ষা:

আমরা দেখলাম সমস্যাটা দু-জনের মধ্যে একজনের অথবা পুরুষ ও মহিলা দু-জনেরই। তাই প্রথমে এবং পরের ধাপগুলোতেও দু-জনকে দেখাটা জরুরি

পুরুষের—পুরো ইতিহাস নিতে হবে। তা ছাড়া জানতে হবে অণ্ডকোষে কখনো আঘাত লেগেছে কিনা, মূত্রতন্ত্রে জীবাণু সংক্রমণ (urinary tract infection) হয়েছে কিনা। বন্ধ্যাত্ব যৌন রোগের জন্যও হতে পারে। হার্নিয়া বা জন্মগতভাবে থলিতে না থাকা অণ্ডকোষ (undescended testis)-এর জন্য অপারেশন হয়েছে কিনা। তাঁর পেশাও জানতে হবে। পেশার কারণে বাড়ি ছাড়া থাকতে হলে প্রয়োজনীয় মাত্রায় যৌনসংসর্গ না হওয়াই স্বাভাবিক। আবার পেশাগত কারণে সিসার মতো কোনো বিষ বা কোনো বিকিরণের সংস্পর্শে আসতে হয় কিনা তা জানাও জরুরি।

মহিলার—মাসিক রজোস্রাবের পুরো ইতিহাস চাই। যদি তাঁর নিয়মিত রজোস্রাব হয়, ২৪-৩৬ দিন ছাড়া, মাসিকের সময় একটু তলপেটে ব্যথা হয় (dysmenorrhoea), মাসিকের আগে স্তনে ব্যথা হয় বা উদ্বেগ অনুভূত

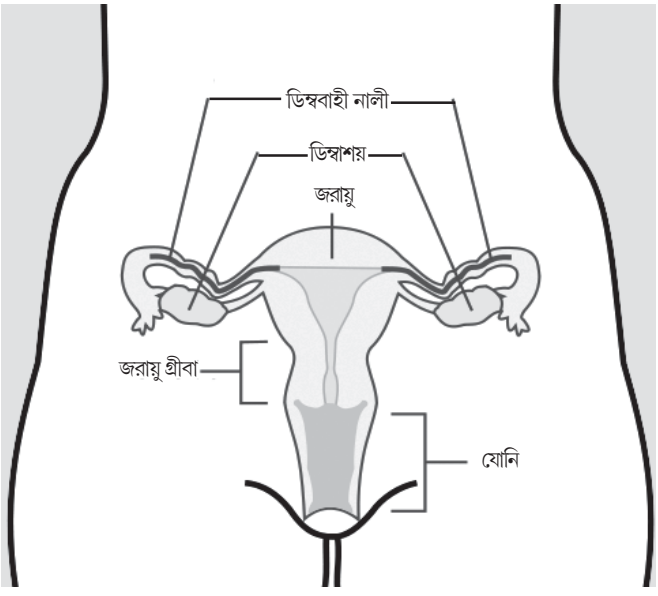

চিত্র ২. স্ত্রী জননাঙ্গ

হয়—তাহলে ধরে নেওয়া যায় ডিম্বাশয়তে ঠিকঠাক ডিম্বাণু ফুটছে। ছোটোবেলায় অ্যাপেন্ডিসাইটিসে অ্যাপেন্ডিক্স ফেটে পেরিটোনিয়ামের প্রদাহ (peritonitis) হলে ডিম্ববাহী নালীর চারপাশে সমস্যা থাকা সম্ভব। তলপেটের প্রদাহ (pelvic inflammatory disease) বা গর্ভপাতের পর জীবাণু সংক্রমণ হলে ডিম্ববাহী নালীতে সমস্যা থাকতে পারে। যাঁরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য কপার-টি জাতীয় জরায়ুর ভেতরে যন্ত্র (intrauterine contraceptive device) ব্যবহার করেন তাঁদের ক্ষেত্রে ডিম্ববাহী নালীর সমস্যা বেশি দেখা যায়। আগে কোনো সম্পর্ক থেকে গর্ভসঞ্চার হয়েছিল কিনা জানা দরকার। গর্ভপাতের ইতিহাস আছে কিনা তাও জানাতে হবে।

শারীরিক পরীক্ষা

- **পুরুষের:** পুরো শারীরিক পরীক্ষা ছাড়াও যৌনাঙ্গের পরীক্ষা করা জরুরি। অণ্ডকোষের আয়তন কতটা দেখতে হয়। আয়তন খুব কম (১০ মিলি-র কম) হলে বন্ধ্যাত্বের কারণ অণ্ডকোষে থাকারই সম্ভাবনা। ভেরিকোসিল আছে কিনা দেখা হয়, যদিও ভেরিকোসিলের জন্য বন্ধ্যাত্ব হয় কিনা তা নিয়ে দ্বিমত আছে।
- **মহিলা:** অনেক সময় স্ত্রীরোগবিদ্ রোগীর সব পরীক্ষানিরীক্ষা করান, অথচ রক্তচাপ মাপতেই ভুলে যান। উচ্চ রক্তচাপে বা কিডনির অনেক অসুখে রক্তচাপ বাড়ে, যেসব অসুখের জন্য বন্ধ্যাত্ব হতে পারে। মহিলার যোনিদ্বার পরীক্ষা জননাঙ্গগুলোর অনেক রোগের হদিশ দিতে পারে।

পরীক্ষানিরীক্ষা

পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখা হয়—পুরুষের বীর্যে কার্যকরী (নিষেকক্ষম) শুক্রাণু যথেষ্ট সংখ্যায় আছে কিনা, মহিলার ডিম্বাণু ফুটছে কিনা, ডিম্ববাহী নালী খোলা আছে কিনা, তলপেটে এমন কোনো রোগ আছে কিনা যাতে গর্ভসঞ্চার বিঘ্নিত হতে পারে, জরায়ুগ্রীবার কোনো সমস্যা আছে কিনা।

বীর্য পরীক্ষা (Semen analysis)

অন্তত তিনবার পরীক্ষা না করে বীর্যকে অস্বাভাবিক রায় দেওয়া উচিত নয় ৩ থেকে ৫ দিন যৌনসংসর্গ বা হস্তমৈথুন না করার পর হস্তমৈথুন করে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরীক্ষা করা উচিত নমুনা সংগ্রহের ২ ঘণ্টার মধ্যে। বীর্য স্বাভাবিক আছে বলা যায়, যদি

- পরিমাণ ২-৫ মি.লি. থাকে,
- প্রতি মি.লি-তে ২ কোটির বেশি শুক্রাণু থাকে,
- ৬০ শতাংশ-এর বেশি শুক্রাণু চলনশীল থাকে,
- অস্বাভাবিক আকারের শুক্রাণু ৪০ শতাংশ-এর কম থাকে।

ডিম্বাণু ফোটার পরীক্ষা

ডিম্বাণু ফুটছে কিনা দেখার জন্য তিনটে পরীক্ষার কোনোটা বা সবগুলো করতে হতে পারে।

শরীরের তাপামাত্রা (Basal body Temperature): সারা মাস ধরে ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে ওঠার আগে, বা কিছু খাওয়ার আগে মলদ্বারের বা যোনিপথের তাপমাত্রা দেখে লিখে রাখতে বলা হয়। তাপমাত্রার লেখ (graph) দেখে বোঝা যায় প্রতি মাসে ডিম্বাণু ফুটছে কি না।

জরায়ুর অন্তরাবরণীর বায়োপ্সি (Endometrial Biopsy): রজোচক্রের দ্বিতীয় অংশে (মাসিকের ১৫ দিন পর থেকে) অন্তরাবরণীর টুকরো কেটে পরীক্ষা করা হয়। এতে ডিম্বাণু ফোটার খবর পাওয়া ছাড়াও অন্তরাবরণীর যক্ষ্মা থাকলে জানা যায়।

প্রোজেস্টেরন হর্মোন মাপা (progesterone assay)

ডিম্ববাহী নালির পরীক্ষা

হিস্টেরোস্যালপিঙ্গোগ্রাফি (Hysterosalpingography): এই ২পদ্ধতিতে যোনিপথে জরায়ুগ্রীবার মধ্যে দিয়ে নল ঢুকিয়ে জরায়ুতে রঞ্জক পাঠানো হয়। এক্স-রে করে দেখা হয় রঞ্জক ডিম্ববাহী নালি দিয়ে পেরিটোনিয়াল গহ্বরে যাচ্ছে কি না।

ল্যাপরোস্কোপি (Laparoscopy): তলপেট ফুটো করে একটা দূরবিন (laparoscope) ঢুকিয়ে জরায়ু, ডিম্বাবাহী নালী ও ডিম্বাশয় দেখা হয়। তলপেটে অন্য কোনো রোগ আছে কিনা তাও দেখা হয়। এই পরীক্ষা করার জন্য রোগীকে অজ্ঞান করতে হয়।

জরায়ুগ্রীবার পরীক্ষা: এই পরীক্ষাগুলো বেশ কঠিন।

বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা কীভাবে করা হয়?

আমরা দেখলাম বন্ধ্যাত্ব অনেক কারণে হতে পারে। বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা সেই কারণের চিকিৎসা।

যৌন সংসর্গের সমস্যা: কোনো কোনো রোগের কারণে যৌনসংসর্গে খুব ব্যথা হলে অপারেশন করে সারানো যায়, যেমন এন্ডোমেট্রিওসিস বা তলপেটের প্রদাহে। যৌনসংসর্গের সময় যোনি পথের খিঁচ (vaginismus) বা লিঙ্গোত্থানের সমস্যা সারাতে অনেক সময় মনোরোগবিদ বা মনস্তত্ত্ববিদ সাহায্য করতে পারেন। লিঙ্গোত্থানের সমস্যায় স্বামীর বীর্য কৃত্রিমভাবে স্ত্রীর জরায়ুতে ঢোকানো যায়।

পুরুষের সমস্যা: যাঁদের বীর্যে শুক্রাণু থাকে না বা খুব কম থাকে সাধারণত চিকিৎসা করে তাঁদের ক্ষেত্রে লাভ হয় না। তবে গোনাডোট্রফিন হরমোনের অভাবের (hypogonadotrophic hypogonadism) কারণে বন্ধ্যাত্ব হলে মানুষের পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত গোনাডোট্রফিন হরমোন প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়। অণ্ডকোষে জীবাণু সংক্রমণ থাকলে উপযুক্ত জীবাণুনাশক দিতে হয়। যাঁদের বীর্যে শুক্রাণু কম, তাঁদের বীর্য থেকে চলনশীল শুক্রাণুগুলো আলাদা করে কৃত্রিমভাবে জরায়ুতে ঢুকিয়ে গর্ভসঞ্চারের চেষ্টা করা যায়।

ডিম্বাণু ফোটার সমস্যা: বিস্তারিত বর্ণনায় না গিয়ে বলা যায়, থাইরয়েড হরমোন (থাইরক্সিন), গোনাডোট্রফিন রিলিজিং ফ্যাক্টর, ব্রোমোক্রিপ্টিন, ক্লোমিফেন সাইট্রেট, মানবশরীরের গোনাডোট্রফিন ইত্যাদি ডিম্বাণু ফোটানোর জন্য ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবহার করা হয়।

ডিম্ববাহী নালীর সমস্যা: এই সমস্যায় সূক্ষ্ম শল্যচিকিৎসা (microsurgery) করার দরকার হতে পারে।

এন্ডোমেট্রিওসিস: এর চিকিৎসায় ওষুধ বা শল্যচিকিৎসা বা দুয়েরই দরকার পড়তে পারে।

যে সব ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্বের কারণ জানা যায় না: সে সব ক্ষেত্রে স্বামীর শুক্রাণু দিয়ে স্ত্রীর ডিম্বাণুকে শরীরের বাইরে নিষিক্ত করে স্ত্রীর অথবা অন্য মহিলার জরায়ুতে স্থানান্তরিত করা হয়। স্বাস্থ্যের বৃত্ত

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য একটি ক্লিনিকে পুরো সময়ের চিকিৎসক

KLOSTER Pharmaceuticals

B/13/H/3, Braunfeld Road, Kolkata-700 027,
Phone : 033 2449-0144, Mob.: 98306 63724
E-mail : kloster_pharma@yahoo.co.in
Website : klosterpharma.com

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

বালবিধবা থেকে মহিলা ডাক্তার

ডা. হৈমবতী সেন-এর

দিনলিপি থেকে

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

কথামুখ

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র চতুর্থ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা জুন-জুলাই ২০১৪-তে ডা. হৈমবতী সেনকে নিয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে জানানো হয়েছিল পাঠককুলের চাহিদা থাকলে পরে 'কয়েক কিস্তিতে হৈমবতীর জীবনের নানা বাঁক ও মোড়, তাঁর পর্যবেক্ষণ, তাঁর মানবিকতা, অদম্য প্রাণশক্তি, নির্ভীক অকপট উচ্চারণ—এসব নিয়ে আলোচনা করা যাবে।'

সম্পাদক জানালেন, পাঠক ডা. হৈমবতী সেন সম্পর্কে আরও জানতে চান। পাঠকের চাহিদা মেটাতে গিয়ে দেখি, ডা. হৈমবতী সেনকে তাঁর সামাজিক পটভূমিতে তাঁর স্থান-কালে তাঁর স্বরূপে ফুটিয়ে তোলা আমার কম্‌মো নয়; ও আমার সাধ্যে কুলোবে না। সব থেকে তো ভালো হয় হৈমবতীর নিজের কথা তাঁর দিনলিপি থেকেই যদি তুলে দিই। সেটাই মনস্থ করলাম। তবে একটা অসুবিধার কথা পাঠকের কাছে কবুল করতেই হয়। হৈমবতীর মূল ডায়রিটি বাংলা ভাষাতেই লেখা। সেটা আছে বটে কিন্তু কোথায়, তার কোনো হদিশ নেই। আর কোনোদিন তার খোঁজ মিলবে কি না তা বলতে পারেন একমাত্র হৈমবতীর ওয়ারিশগণ। আমাদের অগত্যা প্রয়াত তপন রায়চৌধুরী-কৃত দিনলিপিটির ইংরেজি অনুবাদ পড়েই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হয়। কিন্তু যাঁরা ইংরেজি পড়েন না বা পড়তে চান না—তাঁরা তো এ সুবিধেটুকুও পান না। সে কারণে প্রায় বাধ্য হয়েই তপন রায়চৌধুরীর ইংরেজি-অনুবাদ থেকে ফের বাংলা করে হৈমবতীর দিনলিপির গুরুত্বপূর্ণ অংশ দিতে হচ্ছে। জানি, এ অনুবাদে হৈমবতীর নিজস্ব সাহিত্য-প্রতিভার ছিটেফোঁটাও মিলবে না; তবু আখ্যানটা তো থাকবে। তাই-বা কম কী!

দিনলিপি থেকে: পরিবার ও পূর্বসূরিদের কথা

আমাদের আদি ভিটে ছিল খুলনা জেলার নৈহাটি শ্রীরামপুরে। আমার বাবা শ্রদ্ধাস্পদ প্রসন্নকুমার ঘোষ। 'বাঙাল বাহাদুর' নামে খ্যাত শিবনাথ ঘোষ আমার ঠাকুরদা। তাঁর বাবার নাম ভুবনেশ্বর ঘোষ—নিষ্ঠাবান ধার্মিক, পুজোআচ্চা নিয়েই থাকতেন, উদার মনের মানুষ। তাঁর বাবা পরম পুণ্যাত্মা প্রয়াত রাধাকান্ত ঘোষ ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ ধার্মিক মানুষ। তাঁদের পরিবার শাক্ত, হলেও তিনি ছিলেন বৈষ্ণব। পরিবারে তাঁকে 'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ' বললেও অত্যুক্তি হয় না। সম্ভবত তাঁর সময়কালে এদেশে চৈতন্যর প্রভাব খুব বেশি ছিল। আমি ঠিক বলতে পারব না রাধাকান্ত ঘোষের বাবার নাম মাধবচন্দ্র ঘোষ ছিল কি না। শুনেছি, হুগলি বা যশোরের কোনো এক কুলীন পরিবারে মাধবচন্দ্রের জন্ম। তিনি কায়স্থ মহারাজা বিক্রমাদিত্যের কন্যা/ভাইঝিকে বিয়ে করেন। বিয়েতে যৌতুক রূপে যে ভূসম্পত্তি তিনি পান তার বার্ষিক আয় ২৫ লক্ষ টাকা। ফলে তিনি সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। ওই অঞ্চলে বসবাস করার আর একটা কারণ, তাঁর কায়স্থ স্বজাত ('দক্ষিণ রাঢ়ি') তাকে জাতচ্যুত করে, তিনি যেহেতু এক 'বঙ্গজ কায়স্থ'কে বিয়ে করেন। তবে স্বজাতচ্যুত হওয়া নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না।

কে না চায় মহারাজার জামাই হতে! কিন্তু ক-জনই বা আর মাধবচন্দ্রর মতো রূপবান গুণবান পুরুষ! আর সেজন্যই হিংসায় জ্বলেপুড়ে ওরা মাধবচন্দ্রকে জাত থেকে বিতাড়ন করেছিল। তবে টাকার থেকে বড়ো ক্ষমতা তো আর কিছু নেই। অচিরেই তাঁর সব আত্মীয়কুটুম তাঁর কাছে আশ্রয় চেয়ে তাঁর অধিনেই কাজ জুটিয়ে নিল। বিক্রমাদিত্য-কন্যা ছ-টি ছেলে এবং দু-টি মেয়ের জন্ম দিয়ে গত হন। পরে মাধবচন্দ্র স্বজাতে আরেকটি বিয়ে করেন। তাঁরও দুই মেয়ে, দুই ছেলে। ওদের নাম আমি জানি না।

মহারাজা মাধবচন্দ্রকে যে ভূসম্পত্তি দিয়েছিলেন তার বড়ো অংশটিই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রথম পক্ষের সন্তানরা পান। তাঁদেরকে বলা হত বড়ো শরিকের জমিদার। দ্বিতীয় বিবাহজাত সন্তানরাও যথেষ্ট সম্পত্তি পান। তাঁরা ছিলেন ছোটো শরিকের জমিদার। এঁরা বিক্রমাদিত্যর সেরেস্তায় কাজকর্ম করে দেদার ভূসম্পত্তির মালিক হন। তাঁরা যুদ্ধে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিপুল পরাক্রম দেখিয়েছিলেন। রাধাকান্ত ঘোষ বড়ো শরিকের কোনো এক ভাইয়ের ছেলে। কোনজন তা আমি ঠিক জানি না। আমার বাপ-ঠাকুরদার পূর্বপুরুষ রাধাকান্ত ঘোষ। তাঁর তিন ছেলে—ভুবনেশ্বর, বাণেশ্বর ও শিবেশ্বর। ভুবনেশ্বর ঘোষের তিন ছেলে। তাঁদের একজনের নাম সদানন্দ, আর দু-জনের নাম আমি জানি না।

সদানন্দ ঘোষের জন্ম বড়ো শরিকের পরিবারে। তিনি আমার প্রপিতামহ (ঠাকুরদার বাবা)। তাঁর একটি মাত্র ছেলে ও দুই মেয়ে। তাঁর এক ভাইয়ের দুই ছেলে। আর এক ভাই নিঃসন্তান। এঁদের বলা হত মেজো তরফের এবং ছোটো তরফের জমিদার। সদানন্দ ঘোষের ছেলে শিবনাথ ঘোষ এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষ। তাঁর সঙ্গে নীলকর সাহেব রেনি-র প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল। সে লড়াইয়ে বহু মানুষ হতাহত হয়েছিল, নষ্ট হয়েছিল বিপুল ধনসম্পদ। লোকের মুখে মুখে চালু গল্প—কত বার যে নীলকুঠি ভেঙেচুরে ধ্বংস করে ভৈরব নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। লোকে বলে কমপক্ষে একুশ বার। শেষকালে রেনি-র স্ত্রী এবং বড়ো ছেলে

ধরা পড়ল। তাদের বন্দি করা হল। লড়াইয়ে পর্যুদস্ত রেনি শান্তির জন্য সন্ধি চাইলেন। এই লড়াইয়ের সময়ে শিবনাথ ঘোষের নাম পুব-বাংলার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। লড়াই-কালে লোকে তাঁর নামে ছড়া কাটত; আমার সেগুলোর মধ্যে দুটো মাত্র মনে আছে।

জয় হোক বাঙাল বাহাদুর শিবনাথবাবুর—
যিনি চন্দ্র দত্ত, রেনি-র দর্প চূর্ণ করেছেন।

ওই শোনো শিবনাথের ঢাকের বাদ্যি!
আর আমাদের ভয় কী!

শান্তি চুক্তির শর্ত রাখা হল—খুলনায় কোনো নীলকুঠির অনুমতি মিলবে না, তবে রেনি তার কুঠিতে বসবাস করতে পারে। চাষিদের যেসব জমি সে জোর করে জলের দরে কিনে নিয়েছিল, সেসব জমি চাষিদের ফেরত দিতে হবে। তবে রেনি জমি লিজ নিতে পারে—এলাকায় যে দর চালু সেই দরে। এই শর্ত ভাঙলে রেনি-র কুঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে; তার জীবনহানি হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। ইংরেজ-রেনি-র শর্ত মেনে চুক্তি সই করা ছাড়া আর তো উপায় ছিল না। বাকি জীবনটা সে শর্ত মেনে ছেলেপুলে, নাতিপুতিদের নিয়ে জমিদার রূপেই জীবনটা কাটিয়ে দিল। সে-কালে খুলনায় ইংরেজ সরকারের কোনো দপ্তর বা থানা ছিল না। এমনকী পুলিশের টিকিও দেখা যেত না।

সদানন্দ ঘোষের জমিদারি বরিশাল থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর বার্ষিক আয় ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। রেনি-র সঙ্গে যুদ্ধে এর মধ্যে ১২ লক্ষ টাকাই খরচ হয়ে যেত পাইক, বরকন্দাজ, লেঠেলদের পুষতে। বাইরে থেকে কামার ও মুচি পরিবারদের এনে বসানো হয়েছিল ঢাল, বল্লম, সড়কি বানাতে।

শিবনাথবাবু চাষিদের নীলকরদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তা করতে গিয়ে তিনি নিজে দেনায় ডুবে যান। যুদ্ধের খাঁই মেটাতে তিনি মহারাজা প্রতাপাদিত্যর উত্তরসূরিদের থেকে দেনা করেন। সেই দেনা শোধ করার জন্য তিনি যে ভূসম্পত্তিতে বার্ষিক এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা আয় হয়, তা বেচে দিতে বাধ্য হন। প্রতাপাদিত্যর উত্তরসূরিরা সে জমির দখল নিতে ব্যর্থ হন। ফলে প্রতাপাদিত্যের উত্তরসূরিদের সঙ্গে বিরামহীন মামলা-মোকদ্দমা চলতেই থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথবাবু নানা শরিকি মামলাতেও জড়িয়ে পড়েন।

এত জলের মতো অর্থ ব্যয় অথচ মদের নেশায়, বাৎসরিক পালাপার্বণে, ধর্মীয় উৎসবে খরচের বহর কমানোর কোনো লক্ষণই নেই। ভুবনেশ্বর ঘোষ যেসব মন্দির ও ধর্মশালা গড়ে গিয়েছিলেন তার পেছনে মাসে মাসে খরচ তিন থেকে চার হাজার টাকা। ধর্মশালায় যতজন অতিথিই আসুন না কেন, তাদের সকলের খাবার-দাবার এবং কমপক্ষে তিনদিন থাকার বন্দোবস্ত করতেই হবে। তার ওপর রোজের ঠাকুরপুজো, ব্রাহ্মণভোজন এবং ব্রাহ্মণ বিদায়ের খরচ তো আছেই। এই বিপুল খরচ মেটাতে, মামলা-মোকদ্দমায় জেরবার হয়ে, দেনার দায়ে শিবনাথবাবু কিছুটা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর দায়দায়িত্ব মেটানোর আগেই তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হল। মৃত্যুকালে তিনি দুই স্ত্রী, চার ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেলেন।

আমার বাবার বয়স তখন ১৫ কি ১৬। সেসময়ে দেওয়ান (সেরেস্তার ম্যানেজার) ছিলেন নীলমণি চক্রবর্তী ও বাবু বিশ্বম্ভর বসু। আমার কাকা চন্দ্রকুমার, রাজেন্দ্রকুমার, যোগেন্দ্রকুমার ও পিসি অম্বুজাসুন্দরী তখন নেহাতই শিশু। অম্বুজা আমার সৎ-ঠাকুরমার মেয়ে। তবে ছোটোকাকা যোগেন্দ্রকুমার আমার ঠাকুরমারই ছেলে। পুরোনো দিনে কুলীন-মেয়ের বরকে মেয়ের বাপের বাড়ি থেকে কিছু পরিমাণ টাকাপয়সা বৃত্তি হিসেবে দেওয়ার একটা প্রথা ছিল। আমাদের পরিবারেও এই প্রথা মানা হত; পরিবারের মেয়েরা এর ফলে যথেষ্ট উপকৃত হত।

ওই কচি বয়সেই প্রসন্নকুমার বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে বসলেন। বসেই চলতে শুরু করলেন বাবার পথে। বিলাসব্যসন আমোদফুর্তিতে গা ভাসিয়ে দিলেন। তাঁকে বাধা দেওয়ার তো কেউ ছিল না। বরং হিংসার জ্বালায় জ্ঞাতি-কুটুমরা এই সব কাজে তাঁকে মদতই জোগাত। সেরেস্তার কর্মচারীরাও তাঁকে কখনো নিরস্ত করেনি। করবেই-বা কেন? কারণ তিনি যদি নিজেই তাঁর সম্পত্তি দেখাশোনার ভার নেন তবে তাদের লাভের গুড় আসবে কোথা থেকে?

এভাবেই আমার শ্রদ্ধাস্পদ বাবা সম্পত্তিলোভী, লোলুপ জ্ঞাতি-কুটুমের মদতে খুব অল্প বয়সেই মদের নেশার ফেরে পড়েন। মদের নেশায় চুর হয়ে থাকলে অনুষঙ্গ-দোষগুলো যে একে একে আসতে শুরু করবে তাও তো জানা কথা। তবে সেসময়ে বড়োলোকের এ-সব দোষকে খুব একটা ধরা হত না, নিন্দেমন্দ তো নয়ই। বরং লোকে মনে করত ধনী লোকের এসব একটু-আধটু থাকলে তা খুব একটা দোষের না। জমিদারের ছেলে, ছোকরা জমিদার যদি বিলাসব্যসন আমোদফুর্তিতে বেপরোয়া খরচ না করে তবে করবেটা কে? সেকালে মদ্যপান, ব্যভিচার, লাম্পট্যকে বড়োলোকের প্রায় রীত-রেওয়াজ বলেই মেনে নেওয়া হত। এতসব দোষত্রুটি থাকলেও আমার বাবা ছিলেন দরাজ-দিলের মানুষ। তাঁর হৃদয়ের উদারতা আর দরদি মন তাঁর সব দোষ ঢেকে দিয়েছিল। গাঁয়ের সব লোকজন এবং প্রজারা তাঁর দয়ালু মনের পরিচয় অহরহই পেত। ওই এলাকায় আর কোনো জমিদারই তাঁর মতো সদাশয় এবং উদার ছিলেন না। তাঁর প্রজারা কেউই তাঁর দয়ালু-মনের দাক্ষিণ্য হতে বঞ্চিত হয়নি। ব্রাহ্মণ-প্রজাদের জমি নিষ্কর করে দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য জাতের প্রজারাও বিপুল নিষ্কর জমি ভোগদখলের সুবিধা পেয়েছিল। যেসব কুটুমরা তাঁর থেকে বৃত্তি পেত, ঝোপ বুঝে কোপ মেরে তারাও প্রচুর ভূসম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছিল।

সে সময় খুলনায় চালের দর টাকায় দু-মণ। মানুষের জীবনে শান্তি ছিল, ছিল আনন্দ। বিধবা নারীরা জমিদারের 'জেনানা'য়* আশ্রয় পেত। জমিদার-পরিবারকে সবাই এত ভয় পেত যে স্বয়ং যমরাজও ঘোষদের অন্দরমহলে ঢোকবার আগে দু-বার ভাবত। বহু নারী সেখানে আশ্রয় নিতেন, কেননা গ্রামের আর কোথায়-বা তাঁরা এমন নিরাপদ আশ্রয় পেতে পারতেন? (চলবে)। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

জেনানা—অন্দরমহল। সাবেকি ভারতীয় পরিবারে যেখানে কেবল নারীদেরই বসবাস।

লেখক, গ্রন্থ সম্পাদক, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, অভিধানকার।

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

ডাক্তারি পাশ, তবে ডাক্তার নই

অপালা ভট্টাচার্য

১৮৮৬ সাল। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে প্রথম গ্র্যাজুয়েট হলেন এক মহিলা। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। গোটা দুনিয়া হাঁ! এমনটাও হতে পারে . . . একটা মেয়ে হবে কি না ডাক্তার! কেউ কেউ ছি ছি করল, কেউ আবার তাঁর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল। (বহু বহু দশক পরেও যে ধরনের কথা মেডিক্যাল শিক্ষক মহলে ঘুরেছে, a lady doctor is neither a lady, nor a doctor)—একজন মহিলা ডাক্তার মানে তিনি মহিলাও নন, ডাক্তারও নন।

ঘটনাচক্রে, ঠিক ওই বছরই, অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে আর এক ভারতীয় নারী আনন্দীবাই গোপালরাও জোশী সুদূর আমেরিকায় বসে তাঁর স্বপ্নপূরণ করেছিলেন। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন।

২০১৬ সাল। ১৩০ বছরের ব্যবধান। খাস কলকাতার এক নামজাদা মেডিক্যাল কলেজের ক্লাসঘর। ছাত্র-ছাত্রী অনুপাত, ৫৫%-৪৫%। ঘরভর্তি ‘lady doctors’।

কাদম্বিনী দারুণ পশার করতে পারেননি। আনন্দীবাই তো পরের বছরই, ১৮৮৭ সালে মাত্র বাইশ বছর বয়সে মারা যান। পড়তে পড়তেই টিউবারকিউলোসিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। সে সময় এ রোগের তেমন চিকিৎসা ছিল না। মনের জোরে পড়াটা চালিয়ে যান বটে, কিন্তু পড়াশোনা শেষ করে ভারতে ফিরেই তাঁর মৃত্যু হয় . . .।

কাদম্বিনী কিংবা আনন্দীবাইকে মানুষ হয়তো শুধু দেশের প্রথম মহিলা ডাক্তার হিসেবেই মনে রেখেছেন। কিন্তু তাঁরা পথ দেখিয়ে গিয়েছেন হাজারও মেয়েকে। বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ছেলেদের থেকেও বেশি সংখ্যক মেয়েরা ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। বলা ভালো, প্রবেশিকা, পরীক্ষায় কঠিন কঠিন সব প্রশ্নের দারুণ মোকাবিলা করে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করছেন। হিসেবটা এমন—গত ৫ বছরে ছেলেদের তুলনায় ৪৫০০ জন বেশি মহিলা চিকিৎসক পেয়েছে এই দেশ। মেডিক্যাল কলেজগুলোয় ৫১ শতাংশ পড়ুয়াই মহিলা। ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ২৩,৫২২ টি আসন দখল করেছে মেয়েরা। ছেলেরা সেখানে পেয়েছে ২২,৯৩৪ টি আসন।

যদিও ২০১১ সালে বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা *ল্যানসেট*-এ ‘হিউম্যান রিসোর্সেস ফর হেল্‌থ ইন ইন্ডিয়া’ নামে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যায়, দেশে অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদের ১৭ শতাংশ মহিলা! আর তাঁদের মধ্যে মাত্র ৬ শতাংশ মফস্‌সলে গিয়ে কাজ করছেন! অর্থাৎ ১০,০০০ লোকের জন্য মাত্র এক জন মহিলা চিকিৎসক! তাহলে কোথায় গেলেন বাকি মহিলা চিকিৎসকরা? তবে কি আজও তাঁরা হারিয়ে যান পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভিড়ে? ডাক্তারি পড়ার স্বপ্নপূরণ হলেও শেষমেশ আটকে পড়েন হেঁশেলে?

উত্তরগুলোর সন্ধানেই কলম ধরা। যতটুকু জানা গেল তা এই রকম . . .

কাহিনি ১.

মাকে নিয়ে যাচ্ছি হাওয়াবদলে। ট্রেনের সংরক্ষিত কামরায় আমার পাশের আসনে একটি অল্পবয়সি মেয়ে। বয়স ২২-২৩। লম্বা সফর। আলাপ জমে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। জানা গেল, মেয়েটি মারোয়াড়ি। কাজের সূত্রে কোনোভাবে তাঁদের পূর্বপুরুষরা পুরুলিয়া গিয়েছিলেন এবং পাকাপাকিভাবে সেখানেই থাকতে শুরু করেন। আর তাই মারোয়াড়ি মেয়েটি বাংলার জলহাওয়ায় ক্রমেই বাঙালি হয়ে উঠেছেন। তিনি শুধু ঝরঝরে বাংলাই বলেন না, মনেপ্রাণেও বাঙালি। আমার সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালেন, তিনিও ডাক্তার হতে চেয়েছিলেন।

হলেন না কেন? খানিক নিস্তব্ধতা। তার পরই বলতে শুরু করলেন তিনি, ‘কী হবে বলো তো! আমার দিদি পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল। ও-ও ডাক্তারি পড়েছিল। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ছিল ও। তার পর কী হল . . . সেই তো সব ছেড়ে দিতে হল।’

কেন? ‘আমাদের (মারোয়াড়ি) মধ্যে মেয়েদের বিয়ের পরে আর চাকরি করা যায় না . . .। আমার জামাইবাবুও ডাক্তার। তিনি রোজ হাসপাতালে যান। রোগী দেখেন। একবারও আমার দিদির কথা মনেও হয় না। স্বামী-সংসার-বাচ্চা-হেঁশেল, এই তো আমাদের ভবিতব্য!’

কাহিনি ২.

মেডিক্যাল কলেজ থেকেই দু-জনে বন্ধু। সেই বন্ধুত্ব পরে প্রেমে পরিণত হয়। বিয়েও হয়। সমস্যাটা হয় এর পরই। উচ্চশিক্ষা ও আমেরিকান সিটিজেন হওয়ার স্বপ্নে বিদেশে চলে যান ছেলেটি। Long distance relationship-এ বিশ্বাস করেন না মেয়েটি। সবে কলকাতায় একটু একটু করে পশার জমাতে শুরু করেছিলেন তিনি। দেশের মানুষের করের টাকায় পড়াশোনা করে বিদেশে গিয়ে ডাক্তারি করার কোনো ইচ্ছাও ছিল না তাঁর। কিন্তু ভালোবাসার মানুষটির কাছে থাকতে সব ইচ্ছে-স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিলেন তিনিও। (আমাদের দেশে ছেলেরা বদলি হলে, তাঁর বউ সঙ্গে যায়। উলটো কখনো হয় না। অবাস্তব!) সব ছেড়েছুড়ে তিনিও পাড়ি দিলেন বিদেশ-বিভুঁই। অতএব এ দেশে ডাক্তারি ইতি।

কাহিনি ৩.

গ্রামে গিয়ে ডাক্তারি করার ইচ্ছে ছিল স্বাতীর। ছোটো থেকে সে শুনে এসেছে সেখানে মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। হাসপাতাল নেই, ভালো ডাক্তার নেই। আছে বলতে একটা দুটো ছোটোখাটো স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ডাক্তার বলতে হাতুড়ে। অতএব আদর্শের টানে পাশ করার পরই সে চলে যায় বর্ধমানের একটি অজ গাঁয়ে। গ্রামের লোক তো দেখে অবাক। একে শহরের ডাক্তার, তায় মহিলা গ্রামে এসেছে সেবা করতে! কিন্তু এ গল্পের শেষটাও

হয়েছিল সেই রবি ঠাকুরের ছোটো গল্প 'পোস্টমাস্টার'-এর মতো। গ্রামে না আছে পাকা রাস্তা, না ভালো থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। না বিজলি-বাতি। বিনোদন তো দূর অস্ত। মাঝেমধ্যে দূরের গ্রামে এক-আধটা যাত্রাপালা হয়। সেটাও তাঁর পক্ষে দেখা অসম্ভব। টানা এক বছর সন্ন্যাস-জীবন কাটানোর পর শেষমেশ আদর্শকে বিদায় জানিয়ে ফের শহর-পাড়ি।

কাহিনি ৪.

ডাক্তারি পড়া শেষ হওয়ার আগে থেকেই বাড়িতে চেঁচামেচি শুরু হয়ে গিয়েছিল। মেয়ের এবার বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাবে। ভালো পাত্র পাওয়া গিয়েছে। পড়া শেষ হলেই বিয়ের দিনক্ষণ স্থির করে ফেলতে হবে। এত ভালো পাত্র যদি হাতছাড়া হয়ে যায়! ছেলেও ডাক্তার। অর্থোপেডিক সার্জন। বিয়েটা হয়ে গেল। বাড়ির চাপের মুখে আপাত-শান্ত পড়াশোনায় ভালো মেয়েটি আপত্তি জানাল না। এর পরই বড়োদের নতুন আবদার। ছেলের ঠাকুমা এখনও বেঁচে। যেকোনো দিন তিনি ইহলোক ত্যাগ করতে পারেন। বেঁচে থাকতে থাকতে নাতির মুখ (এ দেশে নাতনির মুখ দেখতে চাই, এমন আবদার শুনিনি। বাড়িতে সব সময় গোপালই আসে) দেখে যেতে চান তিনি। এবারও গর্জে উঠতে পারলেন না মেয়েটি। অতএব ফের ইচ্ছাপূরণ। ডাক্তারি কিন্তু বিসর্জন দেননি তিনি। কিন্তু সংসারের মারপ্যাঁচে বড়ো ডাক্তার হওয়া আর হল না তপতীর। স্বামী-সংসার-সন্তানের গণ্ডিতে আটকে পড়ল তাঁর সম্ভাবনাময় কেরিয়ার।

কাহিনি ৫.

ক্লাসের ফার্স্ট গার্লটিকে সবাই সমঝে চলত। কিন্তু সেই মেয়েটিকেই ভালো লেগে যায় সমরেশের। বুক ঠুকে মনের কথা জানিয়েও দেন। সম্মতি জানান মেয়েটিও। তুলনায় কম নম্বর পাওয়া, কম সম্ভাবনাময় ছেলেটির যে ইগো নেই, ভালোলাগার বড়ো কারণ ছিল সেটাই। প্রেম-বিয়ে সবই হল। কিন্তু মেয়েটি আটকে পড়লেন সংসারে। ডাক্তার হলেন ঠিকই, কিন্তু নাম হল না। আর তুলনায় কম নম্বর পাওয়া ছেলেটি আজ সংসারবিমুখ, কাজপাগল, নামজাদা সার্জন।

উপরের প্রতিটি গল্প সত্য ঘটনা অবলম্বনে। যদিও নামগুলি কাল্পনিক।

ডাক্তার হয়েও সামাজিক বিধিনিষেধের জন্য হাত গুটিয়ে বাড়িতে বসে থাকতে হয়েছে, এমন উদাহরণ খুবই কম। তবে নেই তা নয়। স্বামীর পিছন পিছন বিদেশ অনেকেই যান। কেউ কেউ কিন্তু সদিচ্ছাতেই (অনেকক্ষেত্রে নিজের উদ্যোগে) যান। ফলে বিষয়টায় ছেলেদের পুরোপুরি ভিলেন ঠাওরানো উচিত নয়। আদর্শের টানে গ্রামে ডাক্তারি করতে গিয়ে ফিরে আসায় মেয়েটিকে দোষী সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। কারণ বহু ক্ষেত্রে একটি ছোটোখাটো স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালানোর জন্য ন্যূনতম পরিকাঠামোও থাকে না গ্রামগঞ্জে। অনেক সময় নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন মেয়েটি। তার উপর বাবা-মা যেন টেনশনে না ভোগেন! সেই চাপও রয়েছে। বরং তিনি যে অন্তত গরিব মানুষগুলোর জন্য ভেবেছিলেন এবং তাঁদের জন্য কিছু করার চেষ্টাটুকু করেছিলেন, সেটাকে কুর্নিশ জানানো উচিত। তাঁর উদ্যোগকে ব্যর্থ করে দেওয়ার দায়ভার বরং বর্তায় প্রশাসনের উপর। আর সর্বশেষ কাহিনি দু-টি সবচেয়ে বেশি ঘটে থাকে। কারণ, মেয়েদের জীবনে একই সঙ্গে আসে, বিয়ে ও কেরিয়ার তৈরির সুযোগ (ছেলেদের তো বিয়ে বা বয়সের চাপ নেই। সোনার আংটি বাঁকা হয় না। বর বুড়ো হয় না। আর বাংলাদেশে এখনও পাত্রীর অভাব হয় না) বেছে নিতে হয় যেকোনো একটা। আর দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্না লক্ষ্মীমন্ত ঘরনি সংসারকেই বেছে নেন। বিদ্রোহ ঘোষণা খুব কম মহিলাই করেন। বিয়ের আগে যদি বা (বিয়ে না করে), বিয়ের পরে বিদ্রোহ মানে তো বিচ্ছেদ। আবার ভেসে ওঠে মা-বাবার মুখ। তাঁদের কথা, 'একটু মানিয়ে নে মা। এতে তোরই ভালো।'

নামধাম বাদ থাকুক, ডাক্তারির গণ্ডিটাও কিন্তু মেয়েদের জন্য সীমাবদ্ধ। এক মহিলা চিকিৎসকই যেমন জানালেন, মেয়েরা মায়ের জাত। পেডিয়াট্রিশিয়ান (শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ), গাইনোকোলজিস্ট (নারীরোগ বিশেষজ্ঞ), সাইকিয়াট্রিস্ট (মনোরোগের চিকিৎসক) এ সবে তাঁদের উপর লোকে বেশি ভরসা করে। রোগীও বেশি ভিড় করে। যদিও ছেলেদের উপর আস্থা কম এমন ভাবা উচিত নয়। এই মুহূর্তে নামি ডাক্তারদের

তাঁদের নরম মন, কাঁটাছেঁড়া, রক্তারক্তি তাঁরা সহ্য করতে পারেন না (এ দিকে মেয়েদের নাকি কই মাছের প্রাণ, মা হতে গিয়ে কত কষ্টই না সহ্য করতে হয়!)। এক মহিলা চিকিৎসক জানালেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। বললেন, 'ডিসেকশন রুমে প্রথমবার ঢুকে একটি মেয়েকেও অজ্ঞান হতে দেখিনি। বরং ছেলেদের দেখেছি। তবু মানুষের ধারণা, মেয়েরা নাকি সার্জারিটা ঠিক বোঝেন না।'

তালিকায় চোখ বোলালেই তা বোঝা যাবে। মেয়েদের কিন্তু অর্থোপেডিক (হাড়ের ডাক্তার) সার্জন বা যেকোনো শল্যচিকিৎসক হওয়া বেপাড়ায় ঢুকে পড়ার মতো। কারণ, তাঁদের নরম মন, কাঁটাছেঁড়া, রক্তারক্তি তাঁরা সহ্য করতে পারেন না (এ দিকে মেয়েদের নাকি কই মাছের প্রাণ, মা হতে গিয়ে কত কষ্টই না সহ্য করতে হয়!)। এক মহিলা চিকিৎসক জানালেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। বললেন, 'ডিসেকশন রুমে প্রথমবার ঢুকে একটি মেয়েকেও অজ্ঞান হতে দেখিনি। বরং ছেলেদের দেখেছি। তবু মানুষের ধারণা, মেয়েরা নাকি সার্জারিটা ঠিক বোঝেন না।' অথচ গাইনোকোলজিস্ট হলেই কিন্তু চিন্তাভাবনাটা উলটো। মহিলা চিকিৎসকের আক্ষেপ, 'কী আর করা যাবে বলুন, শেষমেশ তো রুজিরুটি। বাধ্য হয়েই রোগী পাব এমন ফিল্ডই বেছে নিয়েছি।'

পুনশ্চ: পাঠকগণ যদি এই সমস্যাকে মেয়েদের থেকেও বেশি সমাজের সমস্যা বলে বিবেচনা করে থাকেন তা হলে বলি, আর পাঁচটা সমস্যার মতো এরও সমাধান আছে। এই সূত্রটুকুই শুধু ধরিয়ে দিলাম। সমাধান আপনারা নিজেরাই করতে পারবেন। স্বাস্থ্যের বৃত্ত

লেখক প্রাবন্ধিক

বাজার থেকে কেনা

ব্যাজার মুখে বাজার করবেন না, বরং জেনে নিন হাসি মুখে বাজার করার সহজ নিয়ম। লিখেছেন **ডা. নীহার রঞ্জন মণ্ডল ও শ্রী শুভদীপ মল্লিক।**

বাজার থেকে খাদ্যসামগ্রী কেনার সময় লক্ষণীয় বিষয়গুলো হল—সেগুলো যেন তাজা-টাটকা, নিরাপদ থাকে ও ভেজাল না হয়। দ্রষ্টব্য: *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* দ্বিতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা পৃ. ৪৪-৪৬, মানসরঞ্জন মাইতি'র লেখা 'ভেজাল খাদ্য ভয়ঙ্কর'।

নীচে বিশেষ কিছু খাদ্যদ্রব্যের ক্রয়সম্পর্কিত গুণাগুণ জানানো হল, যাতে বোঝা যায় সেগুলো টাটকা এবং নিরাপদ কিনা। যেমন—

মাছ

১. মাছের কানকো লাল কমলা হওয়া উচিত।
২. মাছের চোখ হবে উজ্জ্বল।
৩. আঁশগুলো শরীরে উপযুক্ত পরিমাণে থাকবে।
৪. মাছটিতে আঙুলের চাপ দিলে আঙুলটি বসে যাবে না এবং আঁশ ছেড়ে যাবে না। এ ছাড়াও দেখুন বহিরাবরণে যেন ক্ষত না থাকে।
৫. মাছের ল্যাজাটি শক্ত থাকবে।
৬. বরফে রাখা মাছের থেকে তাজা বা টাটকা মাছ অথবা জিওল মাছের গুণাগুণ অনেক বেশি।

মাংস

১. খাসির মাংস একটু রক্তাক্ত হবে, ফ্যাকাশে না দেখায়।
২. মাংস একদম শুকনো হবে না, একটু জলীয় ভাব থাকবে।
৩. চেষ্টা করবেন পরিচিত বা একই দোকান থেকে কেনার—এতে ঠকে যাবার সম্ভাবনা কম থাকে।
৪. অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাসির মাংস বর্জন করুন।
৫. সর্বদা দোকানে প্রদর্শিত মাংস বা ঝোলানো মাংস থেকে আপনার পছন্দের অংশ কেটে দিতে বলুন।
৬. মাংস হাতে নিয়ে দেখবেন মাংস তন্তু (প্রকৃতপক্ষে পেশি) গুলি যেন আলগা না থাকে।
৭. মাংসের উপযুক্ত গন্ধ যেন থাকে।

মুরগি

১. মুরগি সব সময় পরিচিত দোকান থেকে নেবেন। কাটা মুরগি এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।
২. মুরগি কাটার সময় তাজা রক্ত বেরোনোটাই স্বাভাবিক। মাংসের রং লালাভ অথবা গোলাপি হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৩. মুরগি যদি ডিপ ফ্রিজে রেখে থাকেন অথবা বাজার থেকে বরফ-জমা (ফ্রোজেন) মুরগি কেনেন তাহলে সেটিকে রান্না করার আগে গরম জলে বরফ গলাবার চেষ্টা করবেন না। সেটি বিজ্ঞানসম্মত নয়। মুরগিটিকে ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে ফ্রিজের নীচের তাকে বা ফ্রিজের বাইরে রাখবেন। বরফ গলে গেলে সেটিকে কেটে রান্না করুন।

ডিম

১. ডিমের খোলা সাদা হতে হবে, তাতে কোনো চিড় থাকবে না।
২. ডিম কেনার সময় ডিমটিকে হাতে নিয়ে আলোর দিকে ধরুন, ভিতরে জমাট বাঁধা কিছু মনে হলে সেটিকে নেবেন না। তাতে ডিমটি নিষিক্ত বোঝায়। সেটির পুষ্টিগুণ কম, স্বাস্থ্যসম্মত নয়।
৩. ডিম যদি জলে ভাসিয়ে দেন—সেটি ডুবে গেলে জানবেন ডিমটি ঠিক আছে। যদি ভেসে ওঠে তাহলে জানবেন ডিমের ভিতরে পচন ধরেছে।
৪. খোলা থেকে ভাঙা অংশ কিছু বেরিয়ে আছে এরুপ ডিম কখনোই কিনবেন না।
৫. ডিম ভাঙার পর কুসুমের উপর যদি রক্ত বিন্দু দেখতে পান তাহলে সেটি খাবেন না।
৬. ডিমের উপযুক্ত গন্ধ যেন থাকে।

ফল ও সবজি (তাজা ও জমাট-ঠান্ডা/ফ্রোজেন)

১. ফল ও সবজি অবশ্যই টাটকা হওয়া উচিত।
২. ফল ও সবজির রং পরখ করুন। কিছু ফল ও সবজিতে কৃত্রিম রং প্রয়োগ করে রং করা হয়ে থাকে। তাই কেনার সময় জলে ডুবিয়ে বা হাতে ঘসে দেখে নেবেন।
৩. ফ্রোজেন সবজি কেনার ক্ষেত্রে সবজি প্যাকেট স্বচ্ছ হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে ভিতরে রাখা জিনিস বাইরে থেকে দেখা যায়। যদি প্যাকেটের ভিতরে বরফ জমে থাকে সেটিকে কিনবেন না—জানবেন ওই প্যাকেটটিকে Refreezing করা হয়েছে অর্থাৎ একবার গরম হয়ে যাবার পর আবার ঠান্ডা করা হয়েছে।
৪. পরিচিত সংস্থার অথবা পরিচিত দোকানের জিনিস কেনার চেষ্টা করবেন।
৫. নেতিয়ে পরা শাক টাটকা হতে পারে না।

দুধ

বাজারে নানা সংস্থার প্যাকেটজাত দুধ পাওয়া যায়। ডাবল টোন্‌ড, সিঙ্গল টোন্‌ড, ফ্রেশ মিক্স, বিভিন্ন ধরনের পাস্তুরাইজড দুধ আপনি কিনতে পারেন। সর তোলা মহিষের দুধের সঙ্গে জল ও চিনি পরিমাণ মতো মিশিয়ে মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরি করা দুধকে টোন্‌ড দুধ বলা হয়। ৭০°C-এর বেশি তাপমাত্রায় গরম করে জীবাণুমুক্ত করা দুধকে বলা হয় পাস্তুরাইজড দুধ। গুঁড়ো দুধ কিনলে খোলা অবস্থায় না কিনে প্যাকেট কেনাই ভালো। পাড়ায় অনেকে গোরু বা মোষের খোলা দুধ বিক্রি করেন—সেই দুধের ঘনত্ব, রং ও গন্ধ যেন ঠিক থাকে।

টিন বা ক্যান বন্দি খাবার

১. ক্যানের কোনো জায়গা যেন খোলা না থাকে।

২. কোনো জায়গায় যেন ছিদ্র না থাকে।
৩. মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার তারিখ দেখে নেবেন।
৪. কোনো দুর্গন্ধ বের হচ্ছে কিনা তাও পরখ করবেন।

রান্নার বা খাদ্য তৈরির জন্য আরও অনেক কিছুই কেনা যায়, তাদেরও আলাদা আলাদা মাপকাঠি আছে যা এই পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। মাছ-মাংস-দুধ-ডিম থেকে আমরা সবরকমের অতি প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড পাই। এই চারপ্রকার খাদ্যের মধ্যেই জীবাণু সংক্রমণ সবথেকে বেশি এবং দ্রুত ঘটে। তাই এই খাদ্য চতুষ্টয়কে বলা হয় 'বিপদ সম্ভাবনাযুক্ত খাবার'-potentially hazardous foods বা PHFs)। তাই কেনার ব্যাপারে এবং পরে রান্না ও সংরক্ষণের জন্য এগুলোর উপরে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। যে খাদ্যদ্রব্য যতটা প্রয়োজন ততটাই কিনুন।

শেষে আমরা জেনে নিই আর কী কী সতর্কতা নেওয়া দরকার—

❖ পণ্য কেনার সময় রসিদ বা বিল বা ভাউচার অবশ্যই নিন।

❖ ভারত সরকার কর্তৃক শংসিত সামগ্রী কিনলে আপনার ঠকবার আশঙ্কা কম থাকবে। যেমন—

ক. ভোজ্যতেল, ঘি, মাখন, মধু, মশলা ইত্যাদি কেনার প্যাকেটে AGMARK ছাপ দেখে কিনুন। ভারতের মানচিত্রে ওপর ছাপ মারা AG কথাটির অর্থ Agricultural Products বা কৃষিজাত দ্রব্য।

খ. জ্যাম, জেলি, সস্, আচার, ফলের রস ইত্যাদি কেনার সময় FPO ছাপ দেখে কিনুন। FPO কথাটির অর্থ Processed food order product বা ফল প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যের যথাযথ অবস্থা বা ক্রম।

গ. টিন ভর্তি মাছ মাংস ইত্যাদি কেনার সময় MFPO-Meat food products order (খাদ্য মাংস দ্রব্যের যথাযথ ক্রম বা অবস্থা)

❖ প্যাকেট করা জিনিসে উৎপাদকের নাম, উৎপাদনের বছর এবং ওজন বা পরিমাণ লেখা আছে কিনা দেখে নিন।
❖ বিদেশ থেকে আমদানি করা জিনিসের প্যাকেটে আমদানিকারকের নাম, ঠিকানা ও বৈধ রেজিস্ট্রেশন নং থাকতে হবে।
❖ প্যাকেটের এবং পানীয়ের বা জলের বোতলের গায়ে লেখা সর্বোচ্চ খুচরো দামের বেশি দামে কোনো জিনিস বিক্রি করা যাবে না।
❖ ওজন বা মাপে জিনিস কিনতে গেলে দোকানে বৈধ পরিমাণ দপ্তরে শংসাপত্র টাঙানো আছে কিনা দেখে নিন।
❖ অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে বারগুলি কেবলমাত্র ৬০ মিলি (১ পেগ) বা ৩০ মিলি (১/২ পেগ)-এর মাপার পাত্র ব্যবহার করতে পারে এবং তাতে চলতি বছরের জন্য বৈধ এবং পরীক্ষিত ছাপ থাকবে।
❖ আইন অনুযায়ী রসগোল্লা, গোলাপজামসহ সমস্ত মিষ্টান্ন ওজনে বিক্রি করা উচিত।

উপরোক্ত ব্যাপারগুলি নিরাপদ খাদ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবং বৃহত্তর অর্থে 'বাজার থেকে কেনা' আলোচনা করতে গেলে দাম, মাপ ইত্যাদি খুবই প্রাসঙ্গিক। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. নীহাররঞ্জন মন্ডল, এমবিবিএস, বর্তমানে একটি সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে কর্মরত।
শ্রী শুভদীপ মল্লিক, হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্যাটারিং টেকনোলজি প্রশিক্ষিত, বর্তমানে একটি ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা করেন।

Advt.

মিডিয়া কবলমুক্ত, তথ্যনিষ্ঠ বিশ্ব-বিশ্লেষণের ত্রৈমাসিক সম্ভার

বাংলা মান্থলি রিভিয়ু

স্বাধীন মার্কসবাদ-চর্চার অনন্য পত্রিকা

যোগাযোগ: বই-চিত্র, কলেজস্ট্রিট, কফি হাউস, কলকাতা ৭০০০৭৩

মুঠোফোন: ৯৪৭৭৪৩৩৩৫২
৯৮৩০৮৪৭১৫৯

প্রকাশিত হয়েছে: পিট সীগার ক্রোড়পত্র

রান্নাঘরে রান্না

ডা. নীহাররঞ্জন মণ্ডল ও শ্রী শুভদীপ মল্লিক

রান্নার প্রস্তুতির জন্য (ক) প্রস্তুতকারী এবং রাঁধুনির ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, (খ) রান্নার ও খাদ্যপ্রস্তুতকরণের সরঞ্জাম পরিচ্ছন্ন রাখা, (গ) রান্নাঘর ও উনান ও জ্বালানি তৈরি রাখা এবং (ঘ) খাদ্য দ্রব্যের প্রস্তুতিকরণ আমাদের আলোচ্য।

ক. ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি

নিয়মিত চুলকাটা, বা চুল বেঁধে রাখা, সম্ভব হলে শেফস্ ক্যাপ (রাঁধুনির টুপি) বা সাধারণ চুল ঢাকা টুপি ব্যবহার করা উচিত। তাতে খাদ্যে চুল এসে পড়া ঠেকানো যায়। রোজ একবার সম্পূর্ণভাবে এবং যথাযথভাবে স্নান করা এবং সম্ভব হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরেকবার গা-হাত-পা পরিষ্কার করা, নিয়মিত কান পরিষ্কার রাখা, নখ কাটা, এবং নেলপালিশ ব্যবহার না করা, রাত্রে ও সকালে বা দিনে দু-বার খাওয়ার পর দাঁত মাজা, পরিষ্কার পোশাক পরা, সাদা অ্যাপ্রন পরতে পারলে আরও ভালো। হাঁচি কাশি হলে অবশ্যই হাত বা কাপড় দিয়ে নাক মুখ ঢাকা। সর্বদা গভীর নলকূপের জল বা সরকারি সরবরাহ করা জলে বা অন্য নিরাপদ জল ব্যবহার করা। হাত ধোয়া যথাযথ পদ্ধতি মেনে হাত ধুতে হবে। পা-ও পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার। গহনা যত কম পরা যায় ততই ভালো। পুরুষ রাঁধুনির প্রতিদিন ঈষঞ্চদুষ্ণ জলে সাবান দিয়ে দাড়ি কামানো উচিত। শরীরে কাটা ছেঁড়া কোনো জায়গা থাকলে তা জল নিরোধক পট্টি দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত। রান্না ঘরের জন্য আলাদা পরিষ্কার জুতাও ব্যবহার করা যায়। পোশাক হবে পরিষ্কার এবং শুকানো বা শুষ্ক।

খ. সরঞ্জাম

রন্ধন কাজে ব্যবহৃত বাসন ভালোভাবে পরিষ্কার জলে গুঁড়ো সাবান দিয়ে ধোয়ার পর ভালোভাবে জল দিয়ে বাসন থেকে সাবানগুঁড়ো সরিয়ে ফেলতে হবে। তারজন্য একবারে না হলে দু-বারে আলাদা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। রান্নার কড়াই, প্যান ইত্যাদি ব্যবহারের আগে গরম জল করুন আর তাতে একটু লবণ ফেলে খুন্তি বা হাতা দিয়ে নেড়ে জলটি ফেলে দিন। সবজি, মাছ, মাংস ইত্যাদি কাটার ছুরি এবং রাখার পাত্র ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে ব্যবহার করুন, এবং রান্নার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলে সেগুলি অল্প নুন দিয়ে মেজে রাখুন। কাটার পাটাতন ধোয়া মোছার পর নুন দিয়ে ঢেকে রাখলে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি কম হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন রান্নার সরঞ্জাম, খাওয়ার থালা, গ্লাস, বাটি, ইত্যাদি ধোয়ার পর পরিষ্কার কাপড় বা মোছার কাগজ (ন্যাপকিন পেপার) দিয়ে ভালো করে মুছে রাখুন। আলমারিতে তুলে রাখা বাসনপত্র ব্যবহারের আগে পুনরায় ভালো করে ধুয়ে নেওয়া উচিত এবং পরিষ্কার কাপড় বা মোছার কাগজ দিয়ে মুছে ব্যবহার করা উচিত।

গ. রান্নাঘর, উনান ও জ্বালানি

রান্নাঘরের চার দেওয়াল ও উনান পরিষ্কার রাখা বাঞ্ছনীয়। ঘরোয়া উনান ও মাটির দেওয়াল হলেও তা নিয়মিত গোবরজল দিয়ে প্রলেপন দিতে হয়। আধুনিক গ্যাস ওভেন, বৈদ্যুতিক উনান, ইনডাকশান ওভেন, সৌরকুকার বা মাইক্রোওভেন-এর ভিতর, বাহির রোজ বা ব্যবহারের আগে পরিষ্কার করা উচিত। কয়লার আঁচ বা তন্দুরভাট্টি হলেও তা নিয়মিত পরিষ্কার করা দরকার। ইট মাটি দিয়ে তৈরি উনানে বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করা হয়। আঁচ জাতীয় উনানে কয়লা, গুল ইত্যাদি জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এইরকম উনানের সঙ্গে আলাদা গ্যাস-পাইপ এমনভাবে সংযুক্ত করতে হবে যাতে ধোঁয়া রান্নাঘরের বাইরে খোলা আকাশে বেরিয়ে যায়। এই দু-টি ব্যবস্থায় লক্ষ রাখতে হবে জ্বালানি অংশবিশেষ বা ছাই, যেন খাদ্যদ্রব্যে না চলে আসে। এইসব জ্বালানি (কাঠ, ভুষি, ঘুঁটে ইত্যাদি) রান্নাঘরের মধ্যে রাখা হলে তা খাদ্য দ্রব্যের উলটোদিকে আলাদাভাবে এবং ঢেকে রাখা উচিত। এই উনানগুলির জ্বালানির ছাই প্রতিদিন পরিষ্কার করা দরকার। বাকি ব্যবস্থায় যে জ্বালানি যেমন বিদ্যুৎ, এলপিজি (হালকা পেট্রলজাত গ্যাস) বা মাইক্রোওয়েভ (অণুতরঙ্গ) থেকে জীবাণু বা খারাপ কোনো ভৌতপদার্থের খাদ্যদ্রব্যে স্থানান্তর হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটর নিয়মিত পরিষ্কার করা, বাসনপত্র বা রান্নার সরঞ্জাম রাখার ঘর বা জায়গা এবং খাদ্যদ্রব্য রাখার জায়গা বা ভাঁড়ার ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। নিয়মিত দেখা দরকার কোনো খাবার পচে বা খারাপ হচ্ছে কিনা। সেইমতো ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এবং অবশেষে এটা দেখা দরকার যে ওইসব ঘর বা জায়গা বা সাজসরঞ্জামে মাছি, আরশোলা, গুবরে পোকা ইত্যাদি পতঙ্গ এবং ইঁদুর, বিড়াল ইত্যাদি ওই সমস্ত স্থানে না আসে, বা এলেও তাদেরকে যথাযথভাবে মেরে ফেলা বা সরিয়ে দেওয়া দরকার। বটি, কাটার ছুরি, ইত্যাদি এবং পাটাতন ইত্যাদির তিনটি সেট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১. কাঁচা মাছ মাংসের জন্য।
২. সবুজ শাকসবজির জন্য এবং
৩. তৈরি হয়ে যাওয়া খাদ্যের জন্য

নতুবা একটি সেট প্রত্যেক প্রকার ব্যবহারের পর ধুয়ে মুছে তবে পরের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

খ. খাদ্যদ্রব্যের প্রস্তুতি

বিভিন্ন রকমের খাদ্য তৈরি করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ঘরোয়া ভারতীয় রান্নার কুটনোকোটা ও বাটনাবাটা থেকে শুরু করে মিশ্রণ, মাছ-মাংস কাটা খণ্ড বানানো, খোসা ছাড়ানো, কিমা বানানো, গুঁড়ো করা, পেষন, চালা, ছাঁকা, সরতোলা, ঘষাঘষি করা ইত্যাদি প্রক্রিয়া করতে হয়। এই সব প্রক্রিয়ার সময় পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা বাঞ্ছনীয়। শাকসবজি কাটার আগে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। ধোয়া বাদে পূর্বে উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলি যত বেশি আমরা করব পুষ্টিগুণও ততই নষ্ট হবে। পাতার মধ্যে কীটনাশক থেকে যেতে পারে, ভালো করে না ধুলে তা আমাদের পেটে যাবে এবং তা আমাদের শরীরে ছড়িয়ে পড়বে। বারবার এমন হতে থাকলে ভবিষ্যতে

অঘটন অনিবার্য। খোসা যাতে পাতলা করে ছাড়ানো যায় ততই ভালো, না হলে আবরণের কিছু খাদ্যগুণ নষ্ট হয়। যেকোনো জিনিসের কাটা খণ্ডের সাইজ ৩ ইঞ্চি বা ৭.৫ সেমি ব্যাসের বেশি যেন না হয়, নয়তো সম্পূর্ণভাবে রান্না হতে দেরি হবে। চাল ডালও ভালোভাবে জলে ধুয়ে নেওয়া উচিত।

রান্নার আগে সবরকম খাদ্য দ্রব্যের খারাপ হওয়ার লক্ষণ দেখা দরকার। চাল ডালে বিশেষ এক প্রকার পোকা ধরে যাতে চাল ডাল জড়িয়ে যায়। সেই অংশগুলি বাদ দেওয়া দরকার। ডাল বা ছোলায় ছিদ্র দেখা গেলে বাদ দেওয়া উচিত। দুধ বা দুধজাত খাবার, ডিম, মাছ, মাংস ইত্যাদি থেকে কোনোরূপ দুর্গন্ধ যেন না পাওয়া যায়। মাংস কাটার সময় তা হাড় থেকে এবং মাছ কাটার সময় তা কাঁটা থেকে ছেড়ে যাচ্ছে কিনা দেখা দরকার। টিনের খাবারের রং ঠিক আছে কিনা এবং খুললে কোনো খারাপ গ্যাস বেরিয়ে আসছে কিনা দেখা দরকার। পনিরের রং বদলালে বা তিতো স্বাদ হলে ব্যবহার করা উচিত নয়।

রান্নার আগে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কোনোরূপ জৈব পদার্থ যেন না দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু ছত্রাক বা শ্যাওলা মস জাতীয় জিনিস এবং মাছি, পোকামাকড়, দেখতে পাওয়া যায়।

রাসায়নিক যেমন আগাছা মারার ও পোকামাকড় মারার ওষুধ, বা পরিষ্কার করার রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি রান্নাঘরের বাইরে রাখতে হবে। এবং তাতে লাল রঙের লেবেল বা চিহ্ন দিয়ে রাখা উচিত, যাতে তা খাদ্যবস্তুর সঙ্গে দুর্ঘটনাক্রমে না মিশে যায়।

ভৌত পদার্থ যা ঘরের বা শরীরে সাজসজ্জার জন্য ব্যবহৃত হয় যেমন, পিন, ক্লিপ, পাথর কণা, ধুলো-বালি, এমনকী শরীরের লোম বা চুল, নখের অংশ তাও যেন খাদ্যবস্তুর মধ্যে চলে না যায়। সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। রান্নার ঠিক পুর্বে এই সতর্কতাসমূহ নেওয়া দরকার।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. নীহাররঞ্জন মন্ডল, এমবিবিএস, বর্তমানে একটি সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে কর্মরত।
শ্রী শুভদীপ মল্লিক, হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্যাটারিং টেকনোলজি প্রশিক্ষিত, বর্তমানে একটি ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা করেন।

advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়), বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন— ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬।

অথবা ফোন করুন ০৮৪২০০৬৬৫৯৪ অথবা ০৩৩২৫৪৩৭৫৬০।

স্বাস্থ্যসম্মত রান্না

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষিত 'নিরাপদ খাদ্য বছর' (২০১৫) পেরিয়ে এলাম। 'খামার থেকে থালা' পর্যন্ত খাদ্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর রাখার জন্য কেবল ভালো শাকসবজি, ডাল, ভাত, মাছ, মাংস জোগাড় করলেই চলবে না, সে সব যথাযথভাবে রান্না করতে হবে—লিখেছেন **ডা. নীহাররঞ্জন মণ্ডল**।

'ক্রয় করা' এবং 'রান্নার প্রস্তুতি'তে আমরা চক্ষু-নাসিকা-ত্বক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শত্রুদের মোকাবিলা করেছি *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৬ সংখ্যায়। এবার তৃতীয় পর্যায়ে আমাদের মোকাবিলা করতে হবে অ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শত্রুদের। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পাঁচ চাবির মধ্যে তৃতীয় চাবি হল ভালোভাবে বা সম্পূর্ণভাবে রান্না করা। তার জন্য কী করণীয় এবং কেন করণীয় তা আগেই বলা হয়েছে ('রান্নাঘরে রান্না', পৃ.৩৭ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং নিরাপদ খাদ্যের জন্য এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা না করলেও চলে। রান্না ব্যাপারটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত, সুতরাং এ সম্পর্কে জানার কৌতূহল আমাদের সবার এবং নিরাপদ খাদ্যের জন্য এই পর্যায়টি মুখ্য; তাই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র মধ্যেই এর অবস্থান।

নির্বীজন (Sterilization) এবং রন্ধন

সংজ্ঞা অনুযায়ী রান্না হল এক বিশেষ প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর মিশ্রণের ওপর তাপ প্রয়োগে পরিবর্তন ঘটানো হয়। ৭০° সেলসিয়াস তাপমাত্রার ওপরে রেখে যেকোনোভাবে রান্না করলে বেশিরভাগ জীবাণু (ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাস) ধ্বংস হয়। অণুজীববিদ্যা বা মাইক্রোবায়োলজির ছাত্র-ছাত্রীদের রান্নার কথা প্রথম মনে পড়ে যখন তারা শিখতে শুরু করে নির্বীজন বা জীবাণুমুক্তকরণ (Sterilization), 'স্ফুটন' থেকে ফুটিয়ে রান্না, ট্রে-র ওপর স্পিরিট দিয়ে পোড়ানো (Flaming) মনে করায় (Roasting) রোস্টিং। অটোক্লেভিং (Autoclaving) মনে করায় প্রেসারকুকারে রান্না। অণুজীববিদ্যার শিক্ষকরা রান্নার সঙ্গে তুলনা দিয়েই আমাদেরকে জীবাণুমুক্তির পদ্ধতিগুলো শেখাতেন। তা ছাড়া তপ্ত বায়ুপ্রবাহ (Hot-air oven) দ্বারা জীবাণুমুক্ত মনে করায় বেকিং (Baking) বা বায়ুঞ্চোপক্রম এবং পরিচলন ওভেনে রান্না। বিকিরণ দ্বারা (যেমন এক্স-রে, গামা-রে ইত্যাদি দ্বারা নির্বীজন মনে করায় অণুতরঙ্গ (Microwave), অবলোহিত রশ্মি (Infrared) দ্বারা রন্ধন।

উপযোগিতা

রান্না বা রন্ধন প্রক্রিয়া মানবসভ্যতার প্রথম যুগান্তকারী আবিষ্কারের অর্থাৎ আগুন আবিষ্কারের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর ফলে আদিম মানুষ অবশ্যই অনুভব করেছিল সহজভাবে খাদ্য চিবানোর অনুভূতি। তার সঙ্গে ছিল সহজে খাদ্য হজম হওয়া এবং বেশিদিন রোগমুক্ত থাকার সুবিধা। রান্না করা খাবার খেতে সুস্বাদু ও উপাদেয় হয়। খাদ্য হয় রঙে, গন্ধে ও স্পর্শে বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাতে ক্ষুধা বাড়ে। একই জিনিস বিভিন্নভাবে রাঁধলে খাদ্যে বৈচিত্র্য আসে এবং তা হয় আকর্ষণীয়। পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের জটিল রাসায়নিক (প্রোটিন, স্নেহ পদার্থ, শর্করা ও ভিটামিন) রান্নার মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সরল হয়—খাবার হয় সহজপাচ্য ও দেহে শোষিত হয় সহজে। রান্নার ফলে আমরা সুষম খাবার পাই এবং সর্বোপরি বিভিন্নভাবে রান্নার ফলে খাদ্যের পুষ্টিগুণ বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়।

খোলা আগুনে খাদ্য বস্তুকে ঝলসে রান্না করার আদিম পদ্ধতিকে বলা হয় রোস্টিং (Roasting) যা আজও একটা রান্নার ধরন হিসেবে চালু। পরে মানুষ বিভিন্ন পাত্রের ও বিভিন্ন প্রকার উনানের ব্যবহার শেখে এবং রান্নার অন্যান্য পদ্ধতি এসে ক্রমে পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে। অবশেষে বর্তমান যুগে একসঙ্গে অনেক মানুষকে খাওয়ানোর জন্য বিভিন্ন যন্ত্রের ও শক্তির ব্যবহারে রান্না এক বিশেষ রূপ নিয়েছে—রন্ধনশিল্প, যা শিল্পকলা এবং ইন্ডাস্ট্রি-দুয়েরই অংশ।

রন্ধনের শ্রেণিবিভাগ

মাধ্যম অনুযায়ী রান্নাকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে—

ক. শুষ্কভাবে—
   (১) বায়ুঞ্চোপক্রম বা বেকিং এবং
   (২) অগ্নিপক্রম বা ব্রুলিং/গ্রিডলিং

খ. তেল বা স্নেহ পদার্থ সহযোগে—
   (১) রোস্টিং
   (২) ভাজা বা ফ্রাইং
   (৩) জাফরি দ্বারা ভাজা বা গ্রিলিং

গ. জল মাধ্যমে—
   (১) নিম্ন স্ফুটন বা স্টুইং
   (২) পোচিং (৩) স্ফুটন বা বয়েলিং
   (৪) বাষ্পপক্রম বা ভাপা বা স্টিমিং
   (৫) কষা স্ফুটন বা ব্রেজিং।

তাপমাত্রা ভেদে তিনভাগে ভাগ করা যায়

ক. ৭০ ডিগ্রি-১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়; স্টুইং এবং পোচিং।
খ. ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়; বয়েলিং, স্টিমিং, ব্রেজিং।
গ. ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর ওপরে; বাকি অন্যান্য পদ্ধতিসমূহ।

প্রত্যেক পদ্ধতিতে তাপসঞ্চালনের (পরিবহণ, পরিচলন ও বিকিরণ) তিনটি পদ্ধতির কোনো একটি, দু-টি বা কোনো কোনোটিতে তিনটি উপায়ও ব্যবহৃত হয়।

কেক বা পাঁউরুটি তৈরিতে পরিচালিত তাপ বায়ুমাধ্যমে মিশ্রণকে পাকায়, রান্নার পাত্রের সংস্পর্শে থাকা অংশে ঘটে পরিবহণ এবং বিকীর্ণ তাপ বাদামি রং সৃষ্টি করে। কেটলিতে চা কফি বানানোর সময় উনানের

তাপ কেটলির ধাতব পাত্রে পরিবহণ পদ্ধতির মাধ্যমে যায়। ধাতব পাত্র থেকে তাপ জলে যায় এবং তা পরিচলনের মাধ্যমে সমস্ত জলের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। অগভীর ভাজা এবং নাড়িয়ে নাড়িয়ে ভাজা প্রক্রিয়ায় (shallow এবং stir frying) পরিবহণ পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালন হয়।

তরলে (জল ও তেল) এবং গ্যাসীয় (বাষ্প বা গরম বায়ু) মাধ্যমে তাপের পরিচলন ঘটে যেমন সসপ্যানে বা কেটলিতে জল গরম হওয়া। স্ফুটন, গভীর ভাজা, (Deep frying), বাষ্প পক্কম (Steaming), বায়ুষ্ণোপক্কম (Baking) পদ্ধতিতে পরিচলন ঘটে। বাষ্পপক্কম বা বায়ুষ্ণোপক্কম-এদের চাইতে স্টিমিং ও বেকিং বেশি সহজ বা পরিচিত শব্দ। বিকিরণে তাপীয় রশ্মি সরাসরি খাদ্যবস্তুর ওপর গিয়ে পড়ে। জ্বলন্ত কাঠ বা কয়লা থেকে, জ্বলন্ত গ্যাস থেকে বা জ্বলন্ত বৈদ্যুতিক কয়েল বা রড থেকে বিকীর্ণ তাপ খাদ্যকে রান্না করে—রোস্টিং এবং গ্রিলিং পদ্ধতিতে এই প্রক্রিয়া ঘটে।

সময় ও ওভেন পরিচিতি

বিভিন্ন খাদ্যবস্তু ও তার দ্বারা তৈরি বিভিন্ন পদের বিভিন্ন পদ্ধতির সময়ও বিভিন্ন। পাত্রের উপাদানের ওপরও রন্ধন প্রক্রিয়ার সময় নির্ভর করে। তামার পাত্র তাড়াতাড়ি গরম ও তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়। স্টেনলেস স্টিল, লোহা, তাপ নিরপেক্ষ শক্তকাচ, সিরামিক পোড়ামাটি, ইত্যাদি তাপ ধরে রাখে ভালোভাবে। উপাদান ছাড়াও পাত্রের আকৃতির ওপর রান্নার সময় নির্ভরশীল। পাত্র ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের রান্নার জন্য বিভিন্ন ধরনের উনান প্রয়োজন। ইট মাটি দ্বারা গ্রাম্য উনান, কয়লার আঁচ, গ্যাস চালিত উনান, সোলার কুকার, ইনডাকশান বা আবেশক উনানে তন্দুর, বেকিং ও গ্রিলিং করা যায় না। বিদ্যুৎচালিত হট এয়ার ওভেন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন ও সালামান্ডার যন্ত্রে (দু-দিক দিয়ে তাপ সৃষ্টি করা যায়) বেকিং ও গ্রিলিং করা যায়। পরিচলন উনান এবং অধুনা ইনফ্রারেড উনানে বিশেষ কিছু সুবিধা আছে যা পরে আলোচনা করা হবে। কেবলমাত্র বিশেষ ধরনের তন্দুরভাট্টির মধ্যেই তন্দুর বানানো সম্ভব।

দশ বুনিয়াদি পদ্ধতি

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে রান্নার দশ বুনিয়াদি পদ্ধতির নাম আমরা জেনেছি। এই পদ্ধতিগুলির বুনিয়াদি নিয়ম, সুবিধা, অসুবিধা ইত্যাদির তুলনামূলক আলোচনা করলে আশাকরি পাঠকরা বেশি উপকৃত হবেন।

(এই পদ্ধতির সারণি দেখুন ৪৩ পাতায়)

ছয় অধুনা রন্ধনযন্ত্র

১. মাইক্রোওয়েভ ওভেন (অণুতরঙ্গ রান্না)

পুনরায় খাদ্য গরম করার জন্য সাধারণত করা হয়। তা ছাড়া, তেল মাধ্যম রান্না ছাড়া বাকি সব পদ্ধতির রান্না এই ওভেনে করা যায়।

মাইক্রোওয়েভ ওভেনে উচ্চ কম্পাঙ্কযুক্ত তরঙ্গ দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করা হয়। এই যন্ত্রের মধ্যে তরঙ্গ প্রস্তুতকারী একটি অসিলেটর (Oscillator) টিউব থাকে যার নাম ম্যাগনেট্রন। এই টিউবটি ২৪৫০ Hz উচ্চ ক্ষমতার তরঙ্গ প্রস্তুত করে। এতে ৫০০-১০০০ ওয়াট বিদ্যুৎ সংযোগ প্রযুক্ত হয়। এই তরঙ্গ খাদ্যবস্তুর ভিতরে প্রবেশ করে খাদ্যের মধ্যে উপস্থিত জল অণুর প্রচণ্ড রকম আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার ফলে জল অণুর সঙ্গে অন্য অণুর সংঘর্ষ সম্পন্ন হয় এবং সংঘর্ষে উদ্ভূত তাপশক্তি থেকেই রন্ধনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। খাদ্যের ব্যাস তিন ইঞ্চির বেশি হলে কেন্দ্রস্থল কাঁচা থেকে যেতে পারে। মাইক্রোওয়েভ রান্নাযন্ত্রের অভ্যন্তর গরম করতে পারে না। কিন্তু ধাতুদ্বারা প্রতিফলিত হয়। সেজন্য ধাতব পাত্র মাইক্রো-ওভেনের ভিতরে ব্যবহার করা যায় না বা তাতে রান্না সম্ভব নয়। চালু অবস্থায় এই যন্ত্রের দরজা খোলা অনুচিত। বাজারচলতি সব মাইক্রোওয়েভ যন্ত্রের দরজা খুলে দিলে যন্ত্রটি নিজেই 'অফ' হয়ে যায়।

২. ইনডাকশান কুকার (আবেশক রন্ধন যন্ত্র)

এরূপ যন্ত্রের দ্বারা রান্নার পাত্রে তাপ সরাসরি সঞ্চালিত হয় না। চৌম্বকীয় আবেশের দ্বারা রান্নার পাত্রে তাপ সৃষ্টি হয় ও তাপ দ্রুত খাদ্যবস্তু ও রন্ধন মাধ্যমে (জল বা তেল) ছড়িয়ে পড়ে। এই যন্ত্রের দ্বারা পরবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহ অলটারনেটিং চৌম্বকীয় শক্তিতে পরিণত হয়। যন্ত্রের মধ্যে রান্নার পাত্র বসানোর নীচে তামার কুণ্ডলী (কয়েল) (ক্রমান্বয়ে গোলাকার স্প্রিং-এর মতো জড়ানো তার) স্থাপন করা থাকে। বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে তাতে চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের কম্পন ঘটে। তৈরি হয় চৌম্বকীয় ফ্লাশ (ম্যাগনেটিক ফ্লাশ বা আকস্মিক চৌম্বকীয় প্রবাহ বৃদ্ধি); ফলত রান্নার পাত্রে পুনঃ পুনঃ চৌম্বকীয় আবেশ ঘটে। ট্রান্সফরমারের ছেড়ে থাকা চৌম্বকীয় কোরের (ম্যাগনেটিক কোর বা কেন্দ্রের) মতো রান্নার পাত্রে এক প্রকার তরঙ্গের সৃষ্টি করে। পাত্রের উপাদান এর বিরুদ্ধে কাজ করার ফলে নিজে উত্তপ্ত হয় এবং তা খাদ্য বস্তুতে দ্রুত প্রবাহিত করে। রান্নার পাত্র বেশি উত্তপ্ত হয় না।

কাঠ, লোহা, স্টেইনলেস ইস্পাত ইত্যাদি চৌম্বকীয় পদার্থ; তামা, কাচ, অ্যালুমিনিয়াম নির্মিত পাত্র আবেশক রন্ধন যন্ত্রে বসানো যায়।

বলাবাহুল্য আবেশকযন্ত্র এভাবেই গরম প্লেটের বা হিটারের মতো কাজ করে কিন্তু নিজে উত্তপ্ত হয় না। এই ওভেনেও ইলেট্রিক বা মাইক্রোওয়েভ ওভেনের মতো সময়, তাপমান ইত্যাদি পূর্ব নির্ধারণ করার বা পরিবর্তন করার ব্যবস্থা রয়েছে।

৩. স্যালামান্ডার

স্যালামান্ডার নামক উভচর প্রাণীর মতোই এই যন্ত্রে দু-দিক দিয়ে (ওপর ও নীচ) তাপ প্রয়োগ করে রান্না সম্পন্ন করা যায়। সামনের দিক খোলা থাকে। মাঝখানে তাকের ব্যবস্থার সাহায্যে গ্রিল ভিতরে স্থাপন করা যায় বা বাইরে বের করা যায়। সেইজন্য গ্রিলের দু-দিকে দু-টি হাতল আছে। এইযন্ত্র ব্যবহার করার সময় তাপরোধী দস্তানা ব্যবহার অবশ্যই করতে হবে। উন্নতমানের গ্রিলিং ছাড়াও পপকর্ন জাতীয় কিছু তৈরি করা বা ব্রেলিং (বা অগ্নিপক্কম) করা যায়। তাপমাত্রা বাড়িয়ে তন্দুর পদ্ধতিও এই যন্ত্রে সম্পন্ন করা যায়। তাপ প্রবাহের দিক নির্দেশ, (উপর দিয়ে বা নীচ দিয়ে বা উভয় দিক দিয়ে) সময়, তাপমান ইত্যাদি পূর্ব নির্ধারণ করার সুইচ বা বোতাম আছে।

৪. সোলার কুকার বা রান্নার সৌরযন্ত্র

সূর্যালোকের শক্তিকে উপযুক্ত তাপে রূপান্তরিত করে খাদ্য রান্না করতে ও

তরলকে পাস্তুরাইজ (আংশিকভাবে জীবাণুমুক্ত করা) করতে পারে। বেশিরভাগ সৌরকুকার সরল ও দামে কম কিন্তু কিছু সৌর কুকার জটিল ও দামে বেশি। বড়ো সৌরকুকারে একসঙ্গে অনেকজনের খাবারও তৈরি করা যায়। দূষণমুক্ত জ্বালানি এবং কম খরচের জন্য অনেক অ-লাভজনক সংস্থা এই কুকার ব্যবহার করে। তবে এই রান্না প্রক্রিয়া সেখানেই করা যায় যেখানে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পাওয়া সম্ভব। অবতল প্রতিফলকের সাহায্যে বা বিশেষ ব্যবস্থার সাহায্যে সূর্যালোকের তাপশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে রান্নার উপযোগী তাপ ও তাপমাত্রা পাওয়া যায়।

৫. পরিচলন ওভেন (কনভেকশান ওভেন)

খাবার তৈরি করার জন্য এবং সংরক্ষিত খাবার গরম করার জন্য এই যন্ত্র খুবই কার্যকর। এই যন্ত্রের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে সর্বত্র সমান তাপমাত্রা, সাধারণত ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বজায় থাকে।

একটা ব্যবস্থার দ্বারা বায়ুকে আকর্ষণ করা হয় এবং এই বায়ুকে গরম করে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে। রোস্টিং, গ্রিলিং, বেকিং ইত্যাদিও ভালোভাবে করা যায়। খাদ্যের ওজন কমে না এবং গুণাগুণ অনেকটা বজায় থাকে। ফ্রিজ থেকে বের করে ঠান্ডা খাবার সরাসরি এই ওভেনে রেখে ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে রান্না করা বা গরম করা যায়। ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য তো বটেই ব্যস্ততার যুগে পারিবারিক ওভেন হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬. অবলোহিত রন্ধন (Infra Red Cooking)

১.৪-৫$\times$১০$^{-৩}$ মিলিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট অবলোহিত রশ্মি দ্বারা খাদ্য মধ্যস্থ জল বাষ্পে পরিণত হয়ে পরিচলন স্রোত সৃষ্টি করে। ২৬০-৬৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা সৃষ্টি হয় এই রন্ধনে। বেশি তাপমাত্রায় খাবার পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাপমান অনুযায়ী তাপীয় উৎস থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরে পনির, মাছ মাংসের মতো নরম খাদ্য বস্তু রেখে রান্না সম্পন্ন করা যায়। পরিচলন ও বিকিরণ পদ্ধতিতে খাদ্যের মধ্যে তাপ সঞ্চারিত হয়। অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যবহার করা যায় না কারণ তারমধ্য দিয়ে এই রশ্মির গতি কম। এই রন্ধন প্রক্রিয়ায় ৩৪০ গ্রাম মাংস ৬ মিনিটের মধ্যে রান্না করা যায়। ইলেকট্রিক এবং গ্যাস ও দু-ধরনের শক্তি এই রশ্মি তৈরি করতে পারে।

রন্ধন ও বিজ্ঞান

দু-টি দিক আলোচ্য (১) জীবাণু নির্বীজন ও (২) তাপ দ্বারা খাদ্যের রাসায়নিক সমূহের পরিবর্তন

১. জীবাণু নির্বীজন

(ক) ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বেশিরভাগ ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়

(খ) ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বা তার উপরের তাপমাত্রায় রান্না করলে রেণু বহনকারী (spore bearing) ব্যাকটিরিয়া ছাড়া বাকি সব ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাস ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

(গ) উচ্চতাপ ও চাপে রেণুধারণকারী ব্যাকটিরিয়াও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পুষ্টি (Nutrition) এবং স্বাস্থ্যবিধি (Hygiene) সংক্রমণ উভয় দিক যদি আমরা বিবেচনা করি তবে রান্নার আদর্শ তাপমাত্রা হল ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (বেশিরভাগ ভিটামিন সংরক্ষিত থাকে)।

২. খাদ্যের রাসায়নিকসমূহের পরিবর্তন

খাদ্য তা যাই হোক না কেন, কার্বোহাইড্রেট (শর্করাজাতীয়) প্রোটিন জাতীয় ফ্যাট (স্নেহপদার্থ), ভিটামিন, লবণজাতীয় ও জল দ্বারা গঠিত। বাকি অন্যান্য রাসায়নিক পরিমাণে খুবই নগণ্য। বিষাক্ত রাসায়নিক থাকলে তাকে খাদ্য আখ্যা দেওয়া যায় না।

(ক) জল—কেবলমাত্র বাষ্পীভবন নামক ভৌতপ্রক্রিয়া ঘটে, রান্নার সহায়ক।

(খ) খনিজলবণ—রন্ধন তাপমাত্রার মধ্যে উত্তপ্ত হলে কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

(গ) ভিটামিন—প্রথমেই বলিদান হয় ভিটামিন সি, তাপ ও আলোক দ্বারা এটি নষ্ট হয়। ভিটামিন-'বি' গ্রুপের মধ্যে B_{12} বা সায়ানোকোবালামিন গ্রিলিং বা অধিক তাপে রান্না করলে নষ্ট হয়। 'বি' গ্রুপের বাকি সব ভিটামিন ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এর অধিক তাপমাত্রায় নষ্ট হয়ে যায়। A,D,E,K ইত্যাদি চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো সাধারণ রন্ধন পদ্ধতিতে নষ্ট হয় না। গভীর ভাজা পদ্ধতিতে চর্বির বাষ্পীভবনের সঙ্গে এই ভিটামিনগুলির কিছু নষ্ট হয়। রান্নার উপজাত হিসাবে তৈরি জুস বা রস বা ভাতের ফ্যান ফেলে দিলে তার সঙ্গে অনেক ভিটামিনজাতীয় পদার্থ নষ্ট হয়, সঙ্গে জল ও খনিজ লবণও নষ্ট হয়।

(ঘ) শর্করা জাতীয়—আমাদের খাদ্য প্রধানত স্টার্চ। তাপপ্রয়োগে স্টার্চ ফুলে যায়, নরম ও আঠালো হয়। জল মাধ্যমে রান্নার ফলে স্টার্চ অণুর অনেক জায়গায় দু-টি গ্লুকোজ অণুর মধ্যে জল প্রবেশ করে জটিল অণুকে সরল ও ছোটো করে। ফলে তা নরম, আঠালো হয় ও সহজপাচ্য হয়। জল ছাড়া গরমকালে স্টার্চের বাইরের আবরণ ফেটে নরম অংশ বেরিয়ে আসে।

চিনি ইত্যাদি কম আণবিক ওজনের শর্করা রান্নার ফলে তাদের জলে দ্রবণীয়তা বাড়ে, তা ইনভার্ট সুগারে পরিণত হয় এবং সহজ পাচ্য হয়। চিনিতে জল ছাড়া তাপ প্রয়োগ করলে আঠালো হয় ওপরে বাদামি রং ধারণ করে শক্ত হয়। রন্ধন তাপমাত্রার সীমা থেকে অনেক বেশি তাপমাত্রায় তাপ প্রয়োগ করলে পাত্রে কালো কার্বন পড়ে থাকবে।

(চ) প্রোটিন—তাপ প্রয়োগে প্রোটিনের তঞ্চন প্রক্রিয়া ঘটে। ডিমের সাদা অংশ জমে যাওয়া এর সহজতম উদাহরণ। এর ফলে তঞ্চিত খাদ্যের মধ্যে খাদ্যগুণগুলিতে বজায় থাকে। মাছ-মাংস তেল ও জল মাধ্যমে গরম করলে পেশিতন্তুগুলি (গঠনগত প্রোটিন অ্যাকটিন ও মায়োসিন) নরম হয়। এবং তন্তুগুলি আলাদা হয়ে যায়। সহজে চিবানো যায় ও সহজে হজম হয়। কিন্তু জল ছাড়া অত্যধিক তাপমাত্রায় রান্না করলে পেশিতন্তুগুলি সংকুচিত হয়ে যায়, তখন প্রোটিন শক্ত হয় ও হজম করতে অসুবিধা হয়। পেশির মায়োগ্লোবিন, রক্তের হিমোগ্লোবিন পরিবর্তিত হয়ে বাদামি রং ধারণ করে।

(ছ) ফ্যাট বা স্নেহপদার্থ—কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনের মতোই এই জাতীয় পদার্থেও ভৌত ও রাসায়নিক দু-টি পরিবর্তনই ঘটে। গভীর ভাজায় তা বাষ্পীভূত হয়। আবার অল্প তেল পাত্রে থাকলে আঠালো হয়। (পলিমারাইজেশান প্রক্রিয়া) বা প্যানের উপরে বুদবুদের রূপ নেয়, এবং

হাওয়া, জল ইত্যাদির সঙ্গে মিশে এর খাদ্যগুণ হারিয়ে ফেলে এবং নষ্ট হয়ে যায়। কোনো একটি তেল জাতীয় পদার্থ নির্দিষ্ট একটি তাপমাত্রায় (স্মোক পয়েন্ট) নষ্ট হয়ে যায়। তাই, অত্যধিক তাপমাত্রায় না ভাজাই ভালো। কঠিন স্নেহপদার্থ তাপপ্রয়োগে তরলে পরিণত হয়। স্মোক পয়েন্টের উপরে গরম হলে স্নেহপদার্থ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যাক্রোলিনে পরিণত হয়, যা খাবার অযোগ্য। প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে ফ্যাট জাতীয় পদার্থই প্রথমে কালো কার্বন বা খাদ্যে কালো পোড়া দাগ সৃষ্টি করে।

কিছু ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে এরা বিক্রিয়া করে। প্রোটিন ও ফ্যাট করে লাইপোপ্রোটিন, ফ্যাট আর শর্করা করে গ্লাইকোলিপিড এবং প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট করে গ্লাইকোপ্রোটিন যা সবই খাওয়ার যোগ্য। কিন্তু বারবার খাবার গরম করার ফলে বা অতিরিক্ত রান্নার ফলে তিন রকমের অণুতে মিলে তৈরি হয় AGE (Advanced Glycated Endproduct) যা, স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। বারবার একই তেলে ডিপ ফ্রাই করলে AGE তৈরি হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খাদ্যের রাসায়নিক সমূহ মিশ্র পদার্থ হিসাবেই থাকে।

উপসংহার

নিরাপদ খাদ্যের জন্য প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে রান্না করা তা আমরা কী করে বুঝব? যে ভাবেই রান্না হোক না কেন সর্বত্র রং-এর পরিবর্তন একই হবে, রান্না করা খাদ্যের প্রত্যেক অংশ একইরকম নরম হবে বা ভঙ্গুর হবে। রান্না করা খাদ্যবস্তুর কেন্দ্রস্থলে তাপমান কম করে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে এবং সর্বোপরি, আমাদের দাঁত ও জিভ (চেখে দেখা) বিচার করে দেয়। সম্পূর্ণভাবে রান্না হয়েছে কিনা।

ডিমের পোচ যেমন পোচিং নয়, পরোটা ভাজা যেমন তেল বা ঘি মাখানোর পরে ভাজা তেমন বেশিরভাগ রান্নাই একটি বিশুদ্ধ পদ্ধতি মেনে হয় না। তন্দুরি রুটি, ব্রোলিং-এর পরে তন্দুরে সেঁকা হলেও তাতে চর্বি প্রয়োগ না হওয়ায় প্রকৃত তন্দুরি রুটি নয়। ঢাকনা ব্যবহার করলেই অন্য যেকোনো পদ্ধতির সঙ্গে স্টিমিং পদ্ধতি যোগ করা হয়।

বিভিন্ন রন্ধন যন্ত্রের মধ্যে হট্ এয়ার ওভেন কেবলমাত্র বাণিজ্যিকভাবে বেকিং পদ্ধতিতে ব্যবহার হয়। এর ছোটো ঘরোয়া সংস্করণও কিছু প্রস্তুতকারক তৈরি করতে পেরেছেন। এভাবেই রন্ধন শিল্প আজ সামগ্রিকভাবে গৃহবধূর রান্না ঘরের 'হাঁড়ির খবরে' পরিণত হয়েছে।

বিভিন্ন সরঞ্জাম, বিভিন্ন পদ্ধতি, বিভিন্ন খাদ্যবস্তু, বিভিন্ন ওভেন ও বিভিন্ন মাধ্যম দ্বারা বিভিন্ন পদ সৃষ্টিতে সময়, তাপমান, তাপ সঞ্চালনের দিক ইত্যাদি বিভিন্ন। সাধারণ গৃহিণী বা হালুইকর নিজ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় তা জেনে যান। ক্যাটারিং টেকনোলজি বা হোটেল ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার্থীকে শিক্ষকরা তা জানান। কিন্তু রান্না যেভাবেই হোক না কেন নিরাপদ খাদ্যের জন্য রান্না যেন হয় সম্পূর্ণ।

Advt.

প্রাথমিক চিকিৎসা, বিষক্রিয়া ও আহতের যত্ন

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

ফাউন্ডেশন ফর হেলথ অ্যাকশন

পদ্ধতির নাম ও তাপমান	বুনিয়াদি নিয়ম	সুবিধা	অসুবিধা	মন্তব্য
নিম্নস্ফুটন (স্টু পদ্ধতি) ৭০-৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াস স্বল্প তাপে জল মাধ্যমে রান্না।	খাদ্যদ্রব্য জলের মধ্যেই থাকবে। জল কমে গেলে আবার জল ঢেলে খাদ্যদ্রব্যের উপরে জলের উপরিতলকে রাখতে হয়। তাপ ততক্ষণই দিতে হবে যতক্ষণ না খাদ্য বস্তু নরম হয়।	যে সব মাছ মাংসের খণ্ড ভালো ধরনের হয় না। হাড় চর্বি ইত্যাদি উপাদেয় পদে পরিণত হয়। শক্ত ধরনের মাছ মাংসও নরম হয়।	সময় সাপেক্ষ। ভিটামিন সি নষ্ট হয়।	পাত্র ঢাকা রাখলে তা আংশিকভাবে বাষ্পপক্কম পদ্ধতি রান্নায় পর্যবসিত হবে। পুষ্টিগুণ ভালো থাকায় রোগীর পথ্য হয়।
পোচিং ৯৩-৯৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস স্বল্প গরম তরলে সিদ্ধ	জল ভিনিগার বা এদের মিশ্রণে পুরো ডুবন্ত অবস্থায় ডিম মাছ সবজি বা ফলের পোচিং করা যায়। তরল ফুটতে শুরু করলে তাপমাত্রা আবার নামিয়ে দিতে হবে। ভিনিগারের সঙ্গে নুন মেশালে ডিম শীঘ্র জমে যাবে এবং জলের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে না।	বেশিরভাগ পুষ্টি গুণ বজায় থাকে।	সম্পূর্ণ মাত্রায় সিদ্ধ না করায় ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ-মাত্রায় যে জীবাণু নষ্ট হয় তাতে তা থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা। ভিটামিন সি ও B_2 নষ্ট হয়।	তেল দিয়ে যেভাবে আমরা ডিমের পোচ করি তা আসলে অগভীর ভাজা, পোচিং নয়।
স্ফুটন বা বয়েলিং বা সিদ্ধ করা ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস	খাদ্যদ্রব্য জলের মধ্যেই থাকবে। জল কমে গেলে তা আবার পূরণ করতে হবে ফুটন্ত জলের বুদবুদ ও তার পরিচলন অবশ্যই দেখতে পাওয়া চাই। জলের উপরে সর পড়লে তা বাদ দিতে হবে, ঢাকা চলবে না।	সবুজ শাক, সবজি, আলু জাতীয় খাদ্য, ভাত, ডাল ডিম ইত্যাদি অনেক খাবারই এই পদ্ধতিতে তৈরি হয়। বেশির ভাগ জীবাণু ধ্বংস হয়।	বেশিরভাগ জলে দ্রবণীয় ভিটামিন নষ্ট হয়, অনেক পুষ্টিগুণ সিদ্ধ করা জলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।	সিদ্ধ হওয়া খাদ্যের জল যেমন ভাতের ফ্যান ফেলে না দিয়ে স্যুপ বা জুস তৈরি করা যায়।
বাষ্পপক্কম বা স্টিমিং ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাষ্পে রান্না বা ভাপা	ক. অপ্রত্যক্ষ বাষ্পপক্কম উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে রান্নার পাত্র ঢাকলেই হবে। খ. প্রত্যক্ষ বাষ্পপক্কমে সস্প্যান বা হাঁড়ি বা কোনো পাত্রে জল ফুটে বাষ্পীভূত হবে তার উপরে ছিদ্রযুক্ত পাত্রে খাদ্য বস্তু রাখতে হবে (ভাপা পদ্ধতি), যেমন- পুলি পিঠে, মোমো বা আলুভাপা ইত্যাদি।	জীবাণু ধ্বংস হয়, প্রেসার কুকারে স্টিমিং পদ্ধতিতে জীবাণুর স্পোরও ধ্বংস হয় ও সময়ও বাঁচে। খাদ্যের গুণাগুণ বজায় থাকে খাদ্য সহজ পাচ্য।	এই পদ্ধতিতে পুডিং ইত্যাদি তৈরি করার সময় তা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে, তা না হলে ছড়িয়ে যাবে। ভাপা ইলিশ, অন্যান্য মাছ, ডাল এই পদ্ধতিতে করতে গেলে কাপড় বা জলরোধক কাগজ বা কলা পাতা দিয়ে ঢাকতে হবে।	**হাঁড়ি ঢেকে ভাত রান্না এই পদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পুষ্টিগুণ বজায় রেখে নির্বীজন করা খাদ্য তৈরির এটা সব থেকে স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি।**

পদ্ধতির নাম ও তাপমান	বুনিয়াদি নিয়ম	সুবিধা	অসুবিধা	মন্তব্য
কষা স্ফুটন (ব্রেজিং) ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস±চাপ ঢাকা রাঁধা বা গুমে গুমে রাঁধা	রোস্টিং এবং স্টু পদ্ধতির সমন্বয়ে এই পদ্ধতি। ডাল, মাছ, মাংস, ডিম তরকারি ইত্যাদির ঝোল এই পদ্ধতির উদাহরণ। ভারতীয় ঘরোয়া রান্নার এটাই প্রচলিত পদ্ধতি পাত্রে অল্প তেলের সাহায্যে পট্ রোস্টিং বা পাত্রে কষা পদ্ধতির (নিম্নে দ্রষ্টব্য) মাধ্যমে প্রথমে খাদ্যদ্রব্যকে রান্না করা হয় (>৩০০°/সেলসিয়াসে)। পরে তাতে জল দিয়ে স্টু পদ্ধতিতে ভালোভাবে সিদ্ধ করা হয় (<১০০° সেল-সিয়াস)	খাবার সুস্বাদু ও উপাদেয় হয়। ঝোল আলাদাভাবে খাওয়া যায় ভাত-রুটি ইত্যাদির সঙ্গেও খাওয়া হয়।	সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি। বেশির ভাগ জলে দ্রবণীয় ভিটামিন নষ্ট হয়।	এই পদ্ধতিতে ঢাকনার ব্যবহার অপরিহার্য। তাতে সর্বত্র সম্পূর্ণভাবে রান্না করা হয়। ঢাকনা না দিলে আরও সময় লাগে। মাংসের সঙ্গে আলু মেশানো হয় ও সেগুলো বাদামি হলে ২/৩ অংশ জল বা স্টক বা সস্ মিশ্রণ দেওয়া হয়।
ফ্রাই/ভাজা ১৬০ ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস	যেকোনো উদ্ভিজ তেল, ঘি, মাখন, যেকোনো প্রাণীজ তেল বা চর্বিতে তাপ প্রয়োগ করে খাদ্যবস্তুতে ভাজা হয়। এর তিনটি ভাগ— ১) গভীরভাবে (Deep fry) —জিলিপি, সিঙ্গারা, লুচি, তেলে ভাজা ইত্যাদি। ২) অগভীরভাবে ভাজা—(Shallow fry) মাছ, বেগুন, অমলেট, ধোসা, পরটা ইত্যাদি। ৩) নাড়িয়ে নাড়িয়ে ভাজা (Stir) আলু, ছোলা মটর, বিন ইত্যাদি ভাজা।	ভাজা খাবার উপাদেয় হয়। তাড়াতাড়ি খাবার রান্না করা যায়। দীর্ঘ সময় যাবৎ খাদ্য সুরক্ষিত থাকে।	ব্যয়বহুল, হজমে অসুবিধা, খাদ্যে অতিরিক্ত ক্যালোরি যুক্ত হয়। বাষ্পীভবনের জন্য কিছু স্নেহপদার্থ নষ্ট হয়। তার সঙ্গে তেলে দ্রবণীয় কিন্তু ভিটামিনও নষ্ট হয়।	নির্দিষ্ট আকৃতি বিশিষ্ট মাঝারি ধরনের খাদ্য বস্তুতে ডিপফ্রাই করা হয়। অপেক্ষাকৃত বড়ো নির্দিষ্ট আকারের খাদ্য বস্তুকে শ্যালো ফ্রাই করা হয়। অনির্দিষ্ট আকৃতি ও ছোটো করে কাটা খাদ্যবস্তুকে স্টার ফ্রাই করা হয়।
রোস্টিং—কম স্নেহ পদার্থ যোগে ভাজা। চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত— ১. পাত্র মধ্যে রোস্টিং বা কষা পদ্ধতি (১০০-১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস)	মাংস, আলু, অন্য সবজি, ডাল এই পদ্ধতিতে রান্না করা হয়। ব্রেজিং পদ্ধতির প্রথমাংশ এই পদ্ধতিতেই হয়। খাদ্যবস্তুকে অবশ্যই ঢাকা দেওয়া হয়। রান্নার পাত্রের পরিবাহিত তাপ খাদ্যকে যাতে পুড়িয়ে না ফেলে তার জন্য কিছু স্নেহ পদার্থ প্রথমেই ঢেলে রাখা হয়। কষা মাংস, আলুর দম এই পদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।	ব্রেজিং পদ্ধতি ছাড়া এই পদ্ধতিতে রান্না খাবারের সঙ্গে স্টক* মিশিয়ে খাওয়া যায় বা রান্না করা যায়। কষা মাংস বা সবজি বা আলুও খাওয়া যায়।	কেবলমাত্র ভালো ধরনের মাছ, মাংস, সবজি অস্থিসন্ধি রান্না করা যায়।	নাড়িয়ে ভাজার পদ্ধতিতে তেলের ওপর খাদ্যবস্তুকে ছাড়া হয়। এই পদ্ধতিতে রান্নার আগে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে স্নেহপদার্থ মাখিয়ে নেওয়া হয় Marinate (ময়ান বা ময়েন দেওয়া)।

পদ্ধতির নাম ও তাপমান	বুনিয়াদি নিয়ম	সুবিধা	অসুবিধা	মন্তব্য
২.রোস্টিং—উনানে পোড়ানো (ওভেন রোস্টিং) ১৫০- ২৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস	শিক বা স্ক্রু-র সাহায্যে ভালো সাইজের মাংস, শক্ত ধরনের সবজি, আলু বা বেগুন ইত্যাদি এই পদ্ধতিতে তৈরি করা যায়।	খাবার খুব সুস্বাদু হয়। উনানের পরিবর্তে রোস্টিং ট্রে ব্যবহার করা যায়। স্টক্ সহযোগে খাওয়া যায়।	সময়সাপেক্ষ। বাইরের অংশের সম্পূর্ণ রং পরিবর্তন এবং ভিতর পর্যন্ত নরম হলে তবেই তা সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত হবে।	শিক কাবাব এই ধরনের খাবার। বেশি তাপমাত্রায় রন্ধনের ফলে ভিটামিন নষ্ট হয়।
৩. তন্দুর রোস্টিং ২৪০-৪৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস	তন্দুরি ভাট্টি, মাটি ইট দিয়ে তৈরি ওলটানো আঁচের মতো। তাতে কাঠ বা কয়লার আগুন জ্বালিয়ে খাদ্যদ্রব্যে তাপ প্রয়োগ করে রান্না করা হয়।	যথেষ্ট সুস্বাদু খাদ্য তৈরি হয়।	কেবলমাত্র তন্দুর ভাট্টির মধ্যেই সম্ভব। পুষ্টিগুণ কমে।	মাছ মাংস, মুরগি, টিক্কা এই পদ্ধতিতে করা হয়। সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতি।
৪. স্পিট রোস্টিং (খোলা আগুনে ঝলসানো) ২৪০-৪৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।	কাঠের আগুনের শিখায় কাঁচা মাংসকে ভালো করে ঝলসে নিতে হয়।	বিশেষ প্রস্তুতি লাগে না। দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতি।	পুষ্টিগুণ কমে যায়।	রান্নার সর্বপ্রথম বা আদিম পদ্ধতি।
জাফরি পক্কম বা জাফরি দ্বারা ভাজা (গ্রিলিং) ২৩০ডিগ্রি ± ১১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (গ্রিল বা জাফরি দ্বারা তেল মাধ্যমে রান্না)।	গ্যাস, বিদ্যুৎ বা কয়লার উত্তাপে জাফরি বা গ্রিল বা তারের জালের উপর রেখে খাদ্যবস্তুকে রান্না করা হয়। সাধারণত খাদ্যবস্তুকে স্নেহ পদার্থ দ্বারা মাখানো হয় ও মশলা দেওয়া হয়। উপরোক্ত ব্যবস্থায় একদিক দিয়ে তাপ আসে। অধুনা 'স্যালামান্ডার' যন্ত্রে দু-দিক দিয়ে তাপ প্রয়োগ করে গ্রিলিং পদ্ধতি সম্পন্ন করা যায়।	অত্যন্ত সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় পদ পাওয়া যায়। মাছ মাংস সবজি পনির ইত্যাদির বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করা যায়।	গ্রিলার, ওভেন, টোস্টার, স্যালামান্ডার ইত্যাদি যন্ত্র সামগ্রীর সাহায্য নিতে হয়। খাদ্যবস্তুকে যতটা সম্ভব চ্যাপটা করে নিতে হয়।	রান্নার সর্বাধুনিক পদ্ধতি এটাই। গ্রিল মার্কস বা রডের পোড়া দাগ দেখাটা বাঞ্ছনীয়।
বায়ুঞ্চপক্কম বা বেকিং ১৬০ ডিগ্রি ± ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (১০০ ডিগ্রি -২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) শুষ্ক মাধ্যমে রান্না	বদ্ধ উনানে শুষ্ক তাপ বায়ুকে উত্তপ্ত করে। সেই উষ্ণ বায়ু খাবারকে পাকায়। খাদ্যমধ্যে যে জল থাকে তাও বাষ্পীভূত হয়। বেকিং পাউডার বা ঈস্ট থাকার জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড বুদবুদ খাদ্যবস্তুকে নরম করে ও আয়তন বাড়ায়।	খাদ্যের গুণাগুণ অনেকাংশে বজায় থাকে। প্রথম ব্যাবসায়িকভাবে রন্ধন প্রক্রিয়া এটাই।	বেকিং পাউডার বা ঈস্ট ব্যবহার করতেই হয়। ঠিক জায়গায় (ওভেনের মধ্যে) খাদ্যবস্তুর পাত্রকে রাখতে হবে হট এয়ার ওভেন (বায়ুঞ্চো উনান) বা কোনো বিশেষ ধরনের উনান অবশ্যই প্রয়োজন।	কেক্, পাঁউরুটি, পুডিং, প্যাস্ট্রি ইত্যাদি পাশ্চাত্য খাবার। তবে সবজি আলু ইত্যাদির সাহায্যে প্রাচ্য খাবারও বানানো যায়। উনানের কোণে পাত্রকে রাখলে সম্পূর্ণ রান্না হয় না।

পদ্ধতির নাম ও তাপমান	বুনিয়াদি নিয়ম	সুবিধা	অসুবিধা	মন্তব্য
অগ্নিপক্কম ব্রোলিং বা গ্রিডলিং ১৮০ ডিগ্রি ± ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শুষ্কাগ্ন তাপে রান্না।	সরাসরি কাঁচা খাদ্যদ্রব্যকে শুষ্ক তাপের সাহায্যে রান্না করা হয়। (১) গ্রিল বা বেড়ি বা লৌহদণ্ড (শিক), তার ইত্যাদির সাহায্যে এবং (২) পাত্র মধ্যে। তবে গ্রিলিং পদ্ধতির মতো স্নেহ পদার্থ ব্যবহার করা হয় না। ধাতব পাত্রের মধ্যে বালি রেখে সেই গরম বালির ওপর মুড়ি, চাল, খই বা চিড়ে ভুট্টা ভাজা এই ধরনের রান্নার উদাহরণ। সাধারণ রুটি বা চাপাটি তৈরি করা এই পদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।	স্নেহপদার্থের ব্যবহার হয় না বলে ক্যালোরি কম রাখা যায়। সময় কম লাগে।	স্বাদ ভালো হয় না। মশলা, তেল বা অন্য কোনো পদ যোগে খেতে হয়।	স্নেহ পদার্থ ব্যতিরেকে বেগুন বা অন্যান্য সবজি পোড়ানোও এই প্রক্রিয়ার উদাহরণ।

স্টক (stock) শাকসবজি মাংসাদির রস বা জ্যুস। শাকসবজি, মাংস, হাড় ইত্যাদি সাধারণ জলে সিম করা তাপমাত্রায় অনেকক্ষণ ধরে সিদ্ধ করা হয়। এর ফলে উপরোক্ত উপাদানগুলির নির্যাস স্টু করা জলে মিশ্রিত হয়। এই মিশ্রণ পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। একেই বলা হয় স্টক্। 'স্টক' রান্নার পদগুলিকে আরও সুস্বাদু, সুগন্ধ ও পুষ্টিগুণে ভরিয়ে তোলে। প্রাচ্য ঘরানার খাদ্য প্রস্তুতিতে এর বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

ডা. নীহাররঞ্জন মণ্ডল, এমবিবিএস, একটি গ্রামীণ সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: শুভদীপ মল্লিক, অলোক মিস্ত্রী, উত্তম সাহা (সকলেই CCMC -তে শিক্ষকতা করেন) এবং বর্ণিকা মণ্ডল।

ADVT.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান :
দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।
যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com
ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

হাঁটু-ব্যথার উপশম কি সম্ভব?

ডা. অসিত রঞ্জন গোসাই

প্রশ্নটার মনের মতো উত্তর খুঁজে পাওয়া সত্যি দুঃসাধ্য। তবু সবসময় ব্যথা সম্পূর্ণ নিরাময় করা না গেলেও অনেকটাই লাঘব করা যেতে পারে বা প্রথম থেকে সচেতন থাকলে ক্ষয়ক্ষতির বিস্তার রোধ করা সম্ভব হতেও পারে। এখানে সেই উত্তরটাই খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে দেখা যাক। শৈশব থেকে যৌবন, তারপর বার্ধক্য—এই বহমান সময়ে মানব শরীরে কোষ, পেশি, তন্তু, অস্থি-মজ্জা কালের নিয়মে ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে শুরু করে। তখন কর্মক্ষমতা কমে যায়। মাংসপেশি শিথিল হয়ে গ্রন্থি (joint) আড়ষ্ট হয়ে ব্যথার শুরু। হাঁটু আমাদের শরীরের ভার বহন করে। তাই হাঁটু-ব্যথার (osteoarthritis knee) লক্ষণ অনেক আগেভাগেই দেখা যায়। এটা ধরে নেওয়া যায়, ২০১৫-১৬-এর মধ্যে ভারতে মোট জনসংখ্যার প্রতি ৫ জন পিছু ১ জন করে ৬০ ও তার ওপরের বয়স্ক লোক বাস করবে। (সূত্র: UN Population Division World Population Projects, 2012 Revision)। তাই সারা দেশে আজ প্রায় প্রতিটি ঘরে কেউ না কেউ হাঁটু-ব্যথায় আক্রান্ত।

হাঁটুর গঠন সম্বন্ধে একটু জেনে রাখা ভালো। হাঁটুর জয়েন্টের ভিতর দু-টি হাড়—ফিমার ও টিবিয়ার সংযোগস্থলে তরুণাস্থি (cartilage) নামক একটি পদার্থ থাকে। তার চারপাশ ঘিরে হাড়ের সংযোগস্থলে আবৃত করে থাকে সাইনোভিয়াল মেমব্রেন নামক একটি স্বচ্ছ পাতলা পর্দা। ওই পর্দার অভ্যন্তরে একটি তরল পদার্থ (lubricant) থাকে যা দু-টি হাড়ের মধ্যে সংঘর্ষ রোধ করে। এই তরল পদার্থ যখন শুকিয়ে আসে, তখন অস্থিসন্ধির জায়গাটি আর মসৃণ থাকে না। ফলে দু-টি হাড়ের মধ্যে ক্রমাগত ঘর্ষণ লাগে ও যন্ত্রণা শুরু হয়। কার্টিলেজ আমাদের হাঁটুকে নিত্যদিনের চাপ-আঘাত থেকে আগলে রাখে। কার্টিলেজের মধ্যে কোনো নার্ভ থাকে না। হাড়ের মধ্যে নার্ভ থাকে। এই কার্টিলেজ যখন ক্ষয় হতে শুরু করে, তখনই ব্যথা বা যন্ত্রণার বোধ হয়। এই ব্যথা কমতে পারে পেনকিলার জাতীয় ওষুধে, অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি ওষুধে নয়। যৌবনে আমাদের পেশিগুলো শক্ত ও সুঠাম থাকে, তাই হাঁটুর ওপর অতিরিক্ত চাপ না দিয়েই পেশি-তন্তু শরীরের ভার বহন করতে পারে। ৪০-৪৫ বছর বয়সের পরে পেশিগুলো ক্রমশ স্বাভাবিক নিয়মে শিথিল হতে থাকে। আর তখনই শরীরের ওজন বহনের জন্য হাঁটুর ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। কিন্তু হাঁটু সেই সময় অনেক কমজোরি হয়ে যায়। ফলে সেই চাপ নিতে না পেরে হাঁটু-ব্যথার লক্ষণ শুরু হয়। ক্রমেই তা বাড়তে তাকে। আক্রান্ত হাঁটুর মধ্যে হাড়ের কুচি (broken osteophytes) ব্যথার অন্যতম কারণ। এটাই হল হাঁটুর বাত (Primary Osteoarthritis Knee)।

হাঁটু-ব্যথার আরও অনেক কারণ আছে। যেমন—আর্থারাইটিস, গাউট, টেন্ডিনাইটিস, বারসাইটিস, কন্ড্রোমালাসিয়া, ওবেসিটি বা স্থূলতা ইত্যাদি। ওবেসিটি বা স্থূলতা নানা দিক থেকে অস্টিওআরথ্রাইটিসের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। হাঁটুর ওপর বেশি চাপ পড়া ছাড়াও চারিধারে অবস্থিত ফ্যাটি টিস্যুর থেকে বিপাক প্রক্রিয়াজাত যে প্রোটিন তৈরি হয় তার দরুন গ্রন্থির ভিতরে প্রদাহ হতে থাকে। ফলে ব্যথা শুরু হয়। আবার দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা খেলার সময় চোট-আঘাতের দরুন লিগামেন্ট ছিঁড়েও ব্যথা শুরু হতে পারে। তা ছাড়া নির্দিষ্ট কিছু পেশার ক্ষেত্রে যদি জয়েন্টে বারংবার চাপ পড়ে (overuse injury), তা হলেও ব্যথার প্রকোপ বেড়ে যায়। আবার জিনগত কারণেও আরথ্রাইটিস হতে পারে। অনেক সময় হাড়ের জন্মগত বিকৃতি, ত্রুটিপূর্ণ কার্টিলেজ-এর দরুন অস্টিওআরথ্রাইটিসের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

অস্টিওআরথ্রাইটিস যেকোনো বয়সে হতে পারে। ৫৫ বছর পর্যন্ত পুরুষ ও মহিলার ক্ষেত্রে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় সমান। তারপরের থেকে দেখা গেছে মহিলাদের ক্ষেত্রে এর প্রকোপ বাড়তে থাকে। সামগ্রিকভাবে রোগের উপসর্গগুলো হল:

- জয়েন্ট-এর ফোলা ভাব।
- গাঁটের ভিতরে যন্ত্রণা।
- হালকা গরম অনুভূতি।
- গাঁটের ওপরে লালচে আভা।
- হাঁটুর চাপ নেওয়ার এবং নড়াচড়া করার ক্ষমতা কমে যাওয়া (restricted movement)।
- কিছু ক্ষেত্রে চলাফেরার সময় মটমট শব্দ হয়।
- আড়ষ্টতা ও গাঁটে ঘর্ষণজনিত অনুভূতি।
- কিছু ক্ষেত্রে গাঁটে জল জমা।
- কোনো অবলম্বন ছাড়া উঠে দাঁড়াতে না পারা।
- রোগ দীর্ঘস্থায়ী হলে আক্রান্ত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে বাথরুম পর্যন্ত যেতে পারেন না।

হাঁটু-ব্যথার সমস্যায় যাঁরা ভোগেন তাঁরা সাধারণত প্রথমে ডাক্তারবাবুর কাছে পরামর্শ নেওয়ার কথা চিন্তাই করেন না। নিজেরাই দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিতভাবে পেনকিলার জাতীয় ওষুধ খেয়ে থাকেন। তাতে সাময়িক আরাম পেলেও কিন্তু স্থায়ী সমাধান হয় না। এইখান থেকেই পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। মনে রাখতে হবে যে দেহের অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে ফেলতেই হবে আগেভাগে, যদি তা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে। ফলে গাঁটের ওপরে চাপ কম পড়বে এবং রোগের উপসর্গগুলো অনেকটাই কমে যাবে। রোজ নিয়মিতভাবে শারীরিক ব্যায়াম করার অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। তাতে দেহের প্রধান মাংসপেশিগুলো সুঠাম ও সবল হয়ে শরীরের ভার নিতে সাহায্য করবে, ফলে হাঁটুর ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়বে না। হাঁটুর ক্ষয়ক্ষতিও কম হবে। ফিজিওথেরাপির প্রয়োগ স্থায়ী সুফল দান করে। অত্যাধুনিক কৌশল যথা—টেকার, হিট অ্যান্ড কোল্ড থেরাপি, ব্রেস, ইলেকট্রিক্যাল নার্ভ স্টিমুলেসন, ক্লাস ফোর লেসার, আলট্রাসাউন্ড থেরাপি নানারকম পন্থা অবলম্বন করা হয়। নানারকম আসনের ব্যবহার আছে যথা, পদমুদ্রা, একপদ উত্থানপদাসন ইত্যাদি।

এ ছাড়া এই ব্যায়ামগুলো কার্যকর—

Back knee rolling:

প্রতিদিন বালিশের ওপর হাঁটু মিনিট খানেক চেপে ধরে রেখে তারপর আস্তে আস্তে চাপ আলগা করতে হবে। এইভাবে দু-টি পায়েই ১৫ থেকে ২০ বার অভ্যাস করতে হবে। ধীরে ধীরে সময় বাড়াতে হবে। এই ব্যায়ামে হাঁটুর চারিধারের মাংসপেশিগুলো সুঠাম ও সবল হয়। হাঁটুতে রক্ত সংবহন বৃদ্ধি করে স্নায়ুকে সতেজ রাখে। ব্যথা অনেকাংশেই লাঘব হয়।

Straight Leg Rising:

শক্ত জায়গার ওপর চিত হয়ে শুয়ে এক পা সোজাভাবে হাঁটু না ভেঙে ওপরের দিকে তুলে হার্টের লেভেলে বেশ কিছুক্ষণ রাখতে হবে। অপর পা জমির ওপর সমান্তরালভাবে থাকবে। রোজ নিয়মিতভাবে দু-টি পায়ে ২০ সেকেন্ড করে ১০-১২ বার এটা অনুশীলন করা প্রয়োজন। এতে পা ও উরুর পেশিগুলো শক্তিশালী ও সংলগ্ন স্নায়ুর সতেজতা বর্ধিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটুর ক্ষমতা বেড়ে যায়। এই ব্যায়াম হাঁটুর ব্যথা নিরাময়ে অধিক ফলদায়ক।

হাঁটুর ব্যথায় আক্রান্ত ব্যক্তির মেঝেতে বসা, পা ভাঁজ করে বসা নিষেধ। কোনো ভারী বস্তু বহন করা বা বেশি ওজন তোলা নিষেধ। সোজাভাবে ধীর গতিতে হাঁটাচলা করা, কমোড পায়খানা ব্যবহার করা উচিত। নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে যাতে করে শরীরে রক্তের শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকে। যা পরোক্ষভাবে হাঁটুর ব্যথা কমাতেও সাহায্য করে। খাদ্যাভাসের পরিবর্তনও জরুরি। ক্যালশিয়াম জাতীয় খাবার বেশি খাওয়া প্রয়োজন—দুধ, ডিম, সবজি ইত্যাদি।

অবস্থা জটিল আকার ধারণ করলে ক্ষেত্র বিশেষে (End Stage Osteoarthritis) ক্ষতিগ্রস্ত জয়েন্ট অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বাদ দিয়ে কৃত্রিম জয়েন্ট (Total Knee Replacement) প্রতিস্থাপন করা হয়। এই অস্ত্রোপচার ব্যয়বহুল এবং সবসময় ফলপ্রসু না হতেও পারে।

হাঁটুর ব্যথা সমস্ত রকমের আরথ্রাইটিসের মধ্যে প্রধান এবং সব থেকে বেশি দেখা যায়। সময়মতো চিকিৎসা না করলে রোগের লক্ষণ ধীরে ধীরে প্রকট আকার ধারণ করে। চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য হল—

১. ব্যথার উপশম

২. দৈহিক অক্ষমতাকে সামান্যতম করে আনা

৩. জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওষুধ ব্যতীত (non-pharmacologic) এবং ওষুধসহ (pharmacologic) দু-রকম পদ্ধতিই গুরুত্বপূর্ণ।

চিকিৎসা পদ্ধতির বিভিন্ন ধারা

ক. প্রারম্ভিক চিকিৎসা—স্বাস্থ্য শিক্ষা, অনুশীলনী ব্যায়াম (quadriceps knee exercises), ক্ষতিকারক ঘর্ষণের উদ্রেক (mechanical factors) থেকে দূরে থাকা, থার্মোথেরাপি, শরীরের স্থূলতা কমানো, ইলেক্ট্রোথেরাপি, প্যারাসিটামল, ব্যথার মলম, ক্যাপ্সাইসিন প্রলেপ, ব্যথা নিরোধক বড়ি, কন্ড্রইটিন গ্লুকোসামিন জাতীয় ওষুধ, ওয়াকিং এইডস, ব্রেসেস, প্রস্থেটিক্স ইত্যাদি।

খ. গাঁটের অভ্যন্তরে স্টেরয়েড (methyl prednisolone) ইঞ্জেকশন—এই পদ্ধতি কয়েক সপ্তাহ হতে কয়েক মাস পর্যন্ত রোগীকে ব্যথাহীন থাকতে সাহায্য করে। সাধারণত বিয়ের অনুষ্ঠান বা দীর্ঘ ছুটির অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে ইনঞ্জেকশন থেরাপি করা হয়।

গ. গাঁটের অভ্যন্তরে হায়ালইউরনিক অ্যাসিড ইঞ্জেকশন—এই পদ্ধতি ৫-৬ মাস ব্যাপী রোগীকে ব্যথাহীন থাকতে সাহায্য করে। তবে কিছুটা ব্যয়সাপেক্ষ।

ঘ. শল্য চিকিৎসা

১. আরথ্রোস্কোপিক জয়েন্ট ডিব্রাইডমেন্ট—এই পদ্ধতি খুব প্রাথমিক ধাপে কার্যকরী। জয়েন্টের মধ্যে ব্যথা উদ্রেককারী বিচ্ছিন্ন কার্টিলেজের অংশ আরথ্রোস্কোপি করে বার করা হয়। হাসপাতালে ভর্তি না হলেও চলে। অস্ত্রোপচারের জটিলতা কম।

২. রিলাইনমেন্ট অস্টিওমোসিস—এই পদ্ধতিতে শরীরের ভার সুস্থ কার্টিলেজের দিকে চালিত করা হয়। অপেক্ষাকৃত কম বয়সের রোগীর জন্য ভালো। সুস্থ হতে অনেক সময় লাগে। ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে পুনরায় উপসর্গ ফিরে আসতে পারে। কোনো কৃত্রিম প্রস্থেটিক জয়েন্টের মধ্যে প্রতিস্থাপন করতে হয় না।

৩. জয়েন্ট ফিউশন—জয়েন্টকে বাদ দেওয়া এবং জয়েন্টের মধ্যের উভয়দিকের হাড়কে জুড়ে একটি লম্বা হাড়ে পরিণত করা। যেখানে হাঁটুর কৃত্রিম প্রতিস্থাপনের পর বারে বারে সংক্রমণ হয় সেইসব ক্ষেত্রে এই অস্ত্রোপচার সাধারণত করা হয়ে থাকে।

৪. হাঁটুর কৃত্রিম প্রতিস্থাপন—৭০ বছর বয়সের পর, যাদের সব সময় ছোটাছুটি করে কাজ করতে হয় না, জয়েন্ট পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত, কার্টিলেজ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে সেখানে প্রয়োগ করা হয়। নষ্ট হয়ে যাওয়া অংশ বাদ দিয়ে কৃত্রিম প্রস্থেটিক জয়েন্টের মধ্যে প্রতিস্থাপন করা হয়। তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় এই অস্ত্রোপচারে লেগে যায়, আর খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। সর্বদা স্থায়ী সমাধান না হতেও পারে। কিন্তু শেষ পন্থা হিসাবে (Terminal Stage Therapy) সঠিকভাবে নির্বাচিত রোগীর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

শরীরের স্থূলতা (obesity) কমানো—যে সমস্ত অনুশীলনী শরীরের স্থূলতা কমাতে সাহায্য করে সেগুলোই অভ্যাস করা ভালো যেমন—সাঁতার, সাইক্লিং, প্যাডলিং ও হাঁটা যদি ব্যথাদায়ক না হয়। যেকোনো অনুশীলনী যদি ব্যথাদায়ক হয়, শুরুর সময় হোক বা তারও পরে, তা হলে তা বন্ধ করা উচিত। একটি লাঠির সাহায্যে হাঁটাচলা করা এই রোগীদের ক্ষেত্রে অনেক উপকারী। এটা আক্রান্ত গাঁটের দিকে শরীরের ভার বহন লাঘব করে। লাঠির বিকল্প হিসাবে ক্র্যাচ ব্যবহার করা যায়। খাদ্যাভাসের পরিবর্তন করাও জরুরি।

চিকিৎসার মূল লক্ষ্য

ক. গাঁটের ব্যথার উপশম ও ফোলা কমানো।

খ. কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে আনা (Activity Daily Living) যথা—আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেই নিজের নিত্যদিনের কাজ করতে সক্ষম হয়, যেমন পোশাক

পরিধান, স্নান, খাওয়া, প্রস্রাব-পায়খানা, হাঁটা-চলা, সিঁড়ি ভাঙা ও নিজের যত্ন নিজে করা।

Instrumental Activity Daily Living—আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেই দোকান-বাজার, আয়-ব্যয়ের হিসাব, ব্যাঙ্কিং টেলিফোনে কথা বলা, রান্নাবান্না, ধোয়াধুয়ির কাজ, কাপড়জামা কাচা ইত্যাদি সকল প্রকার কাজ যেখানে সামান্যতম দক্ষতার প্রয়োজন আছে তা নিজে নিজে করতে পারে।

সামগ্রিকভাবে রোগী ও তার পরিবার, ডাক্তারবাবু, ফিজিওথেরাপিস্ট সকলের সম্মিলিত পদক্ষেপ ও প্রচেষ্টা, তাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয় ও তার দ্রুত প্রতিকার, একই সঙ্গে সম্পর্কিত অসুখগুলির চিকিৎসা করা এবং নিয়মিত ডাক্তারবাবুর তত্ত্বাবধানে থাকা ইত্যাদি সবই রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ জীবনযাত্রার পথে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অসিত রঞ্জন গোসাই, এমবিবিএস, ডিপিএইচ, ডিজিএম (জেরিয়াট্রিক মেডিসিন), সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রশাসক ছিলেন। বর্তমানে জেরিয়াট্রিক মেডিসিন নিয়ে কর্মরত।

Advt.

রোগ নির্ণয়, রোগীর সেবাযত্ন ও
ওষুধ নিয়ে কিছু তথ্য

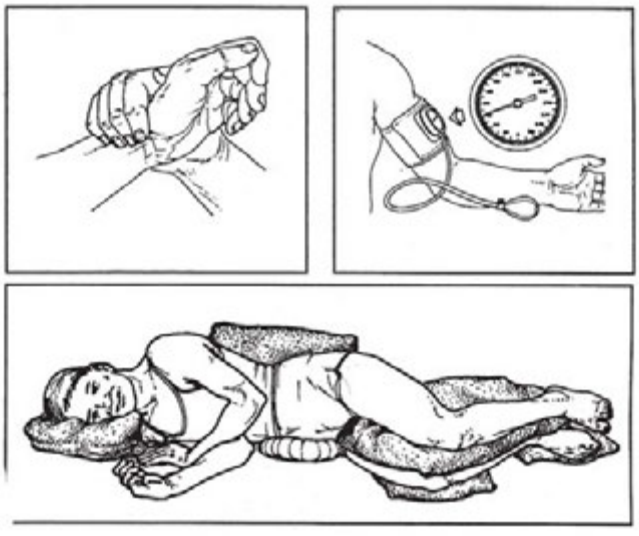

ডা. পুণ্যব্রত গুণ
শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ

পুকুর-নদী থেকে পানযোগ্য জল সংগ্রহ

আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড দূষিত গ্রামগুলিতে ছোটো ছোটো জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ব্যবস্থা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে করা যেতে পারে, এবং সেরকম বাস্তব উদাহরণও রয়েছে—লিখেছেন **মানসরঞ্জন মাইতি**।

জলসংকট ও ব্যবহারের অধিকার

জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি, ভোগ্যপণ্যের বিবেচনাহীন চাহিদা ও বিপুল অঙ্কের মুনাফা অর্জনের তাগিদে মানুষ অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করছে। 'উন্নয়ন'-এর এই বিরূপ প্রভাবে সারাবিশ্ব আজ নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে যার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল জলের দূষণ ও নিরাপদ পানীয় জলের সংকট।

জল এমন একটি প্রাকৃতিক সম্পদ তাকে ব্যবহার করার অধিকার আছে সমস্ত মানুষের ও জীবকুলের। বহুচর্চিত পুরোনো কথা মনে পড়ছে, 'জলই জীবন'। জল এমন একটি রাসায়নিক পদার্থ যা তার বৈজ্ঞানিক পরিচিতিকে অতিক্রম করে মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রতীক হিসাবে স্থান করে নিয়েছে।

জল ও স্বাস্থ্য

২০০২ সালে 'হু' (বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা WHO)-র একটি প্রতিবেদনে জানা যায় প্রায় ২.৫ কোটির কাছাকাছি মানুষ স্বাস্থ্যকর শৌচব্যবস্থার সুবিধা ও ১.১ কোটি মানুষ নিরাপদ পানীয় জলের উৎস থেকে বঞ্চিত। কেবলমাত্র অসুরক্ষিত জলের কারণে ডায়াবেটিস, কলেরা, আমাশয়, কৃমি, ভাইরাল হেপাটাইটিস, জন্ডিস দেখা দিতে পারে। ভারতবর্ষে এমন প্রতি বছর প্রায় ১৫ লক্ষ শিশু (৫ বছরের কমবয়সি) ডায়রিয়াতে মারা যায়। পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক বা ফ্লোরাইডের মতো দূষকের বৃদ্ধির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কোটি কোটি মানুষ।

পানীয় জল জীবাণুমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। পানীয় জলে কোনো প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ক্ষতিকর বা মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে থাকা উচিত নয়। পানীয় জল স্বচ্ছ গন্ধহীন ও বর্ণহীন হওয়া একান্ত জরুরি। অনিরাপদ বা দূষিত জল পান করলে বিভিন্ন প্রকার জলবাহিত রোগ হয়। ফলস্বরূপ—

১. গ্রামাঞ্চলে জল এবং জলবাহিত রোগে আক্রান্ত বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে দিনমজুরি থেকে বঞ্চিত হন। ফলে পরিবারগুলি অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হন।

জলের অর্থনীতি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

২. বাড়ির কাছাকাছি অঞ্চলে নিরাপদ পানীয় জলের অভাব থাকলে গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের এবং শিশুদের জল নিয়ে আসতে হয় দূরবর্তী অঞ্চল থেকে। এর ফলে তাদের যথাযথ শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

৩. ভারতবর্ষের শুষ্ক অঞ্চলগুলি, যেমন রাজস্থানে, বাচ্চা মেয়েরা এবং মহিলারা প্রতি বছর কয়েক হাজার কিলোমিটার পায়ে হেঁটে চলেন বাড়ির জল আনবার জন্য (Shiva & Jalees 2005)। এই সময়টুকু যদি পড়াশোনার জন্য ব্যয় করা যেত তাহলে তাদের শিক্ষার প্রসার অনেক বেশি মাত্রায় সম্ভবপর হত। পাশাপাশি জলসংগ্রহের জন্য এত সময় ব্যয় করার কারণে তাদের জীবনের অন্যান্য গঠনশীল কাজের জন্য সময় থাকে না ও তাদের স্বাস্থ্যও বিঘ্নিত হয়। অন্যদিকে সমাজ ও পরিবার যেসব কাজকে (যেমন অর্থকরী কাজ) মূল্য দেয়, তাতে তারা অংশগ্রহণ করতে পারে না বলে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত থাকে।

৪. মনে পড়ে, পশ্চিম মহারাষ্ট্রের 'দেন গামল' গ্রামের কথা—যেখানে পুরুষেরা একাধিক বিবাহ করেন শুধুমাত্র বহুদূর থেকে পানীয় জল সংগ্রহের জন্য। বা বলি তামিলনাড়ুর সেই 'ওয়াটার ট্রেনটি'র কথা সেটা প্রতি গ্রীষ্মে চেন্নাই স্টেশন থেকে বেরোয় শুধুমাত্র পানীয় জলের পাত্র সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের একটি বড়ো অংশের পানীয় জলহীন মানুষের কাছে পৌছানোর জন্য (Barlow 2003)।

আশঙ্কা করা হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি কোনোদিন হয় তার মূল কারণ হবে পৃথিবীর পানীয় জল সম্পদ।

পানীয় জলের অসুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যবিধি

- কেবলমাত্র দূষিত জলের জন্য ৮০ ভাগ রোগ হয়ে থাকে এবং মৃত্যুও ঘটে।
- পদ্ধতিগত কারণে, সরবরাহের সময় এবং সংগ্রহ পাত্র ও বাড়িতে সঠিকভাবে জল সংরক্ষণের অভাবে জলের দূষণ হয়ে থাকে।
- হাত না ধুয়ে জলের পরিবেশনের সময় জল দূষিত হতে পারে।
- পানীয় জলের কাছে শৌচালয় থাকলে জল দূষিত হতে পারে।
- এভাবে দূষণ আটকাতে হলে জল নিরাপদ উৎস থেকে সংগ্রহ করা ও বাড়িতে জলের গুণগত মান পরীক্ষা করা দরকার।
- পানীয় জল অল্প সময়ের জন্য সঞ্চয় করা, সরু গলাযুক্ত পাত্রে জল সংরক্ষণ করা ও পাত্রের মুখ ঢেকে রাখা ও জল সংগ্রহের আগে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া দরকার।
- শৌচালয় ব্যবহার করার ব্যাপারে কিছু বিধি মানা প্রয়োজন। যেমন—শৌচালয়ের স্থান থেকে পানীয় জলের উৎস (নলকূপ বা কুয়ো) উঁচু স্থানে করা। শৌচালয়ের জল যেন কোনো উৎসের কাছে এসে না পড়ে তা লক্ষ করা এবং পানীয় জলের উৎস থেকে অন্তত ১৫ মিটার দূরে শৌচালয় তৈরি করা।

জলের চাহিদা ও জোগান

বাড়ির ঘরকন্নার কাজে জলের প্রয়োজন গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে বেশি ধরা হয়। ভারত সরকারের শহর উন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী বড়ো বড়ো শহরে (দিল্লি, কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু প্রভৃতি) **জন পিছু জলের ন্যূনতম চাহিদা প্রতিদিন ১৫০ লিটার।**

অন্যান্য শহরে যদি ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী থাকে অথবা খুব নিকট ভবিষ্যতে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের কর্মসূচি থাকে তবে ওই শহরগুলির **জনপিছু জলের ন্যূনতম চাহিদা ৭০ লিটার।**

পৌরসভার লোকেদের ন্যূনতম জলের চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব পৌরসভাগুলির ওপর ন্যস্ত।

ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী **গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহের পরিমাণ জনপিছু চাহিদা প্রতিদিন ৪০ লিটার। কিন্তু মরুভূমির গ্রাম-অঞ্চলে এই চাহিদার পরিমাণ দৈনিক ৭০ লিটার।**

আমাদের দেশে গার্হস্থ্য জল সরবরাহ ব্যবস্থা ভূগর্ভস্থ উৎস থেকে করা হয়। এ ছাড়া কিছু অঞ্চলে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা হয়। তবে পাহাড়ি এলাকায় জল সরবরাহের মূল উৎস ভূপৃষ্ঠের জল। উদাহরণ ঝরনা, হ্রদ ইত্যাদি। দেশের বড়ো শহরে মূলত ভূ-পৃষ্ঠের জল সরবরাহ হয়ে থাকে। কিন্তু দেশের অনেক ছোটো এবং মাঝারি শহরে এখনও ভূগর্ভস্থ জল সরবরাহ করা হয়।

গুণগত মান অনুযায়ী ভূগর্ভস্থ জল (খোলা কুয়ো ও ইঁদারা ছাড়া) সাধারণত জীবাণুমুক্ত। কিন্তু কুয়োর জল জীবাণু দ্বারা দূষিত, বাঁধানোর ইঁদারার জলও কম হলেও দূষিতই। ভূগর্ভস্থ জলে লবণের (chloride) পরিমাণ বেশি থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রেই দ্রবীভূত লোহার (লোহার নানা যৌগ) আধিক্য থাকে। খরতা (Hardness) ভূগর্ভস্থ জলে বেশি। বর্তমানে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে ভূগর্ভস্থ জলে রাসায়নিক পদার্থের দূষণ থাকার সম্ভাবনা থাকে। অন্যদিকে, ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল সাধারণত জীবাণু দ্বারা দূষিত। তবে এই জলে দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ কম থাকে। এই জলে খরতা কম থাকে এবং দ্রবীভূত রাসায়নিক পদার্থের আধিক্য থাকে না। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলে বিভিন্ন কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য জল মিশ্রিত হওয়ার ফলে রাসায়নিক দূষণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। **ভূ-গর্ভস্থ জল বেশিরভাগ অঞ্চলে কোনো প্রকার পরিশোধন ছাড়াই সরাসরি পান করা যায়। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল পানীয় রূপে ব্যবহার করার আগে পরিশোধনের প্রয়োজন হয়।**

ভারতবর্ষে ভূগর্ভস্থ জলে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে গুণগত মানের পরিবর্তনের ফলে সেই জল পানীয় রূপে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এবং গার্হস্থ্য কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক আধিক্যের ফলে চামড়া, পরিপাকতন্ত্র, যকৃৎ, স্নায়ু, ফুসফুস প্রভৃতি আক্রান্ত হতে পারে ও ফ্লোরাইড আধিক্যের ফলে দাঁতের রোগ, হাড়ের ক্ষয়রোগ এবং অন্যান্য শারীরিক রোগে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে।

আবার ভূগর্ভস্থ জলে অনেক সময় দ্রবীভূত লোহার আধিক্য (>১ মিলিগ্রাম/লিটার) দেখা যায়। জলে দ্রবীভূত লোহার যৌগের উপস্থিতি মানুষের শরীরে সরাসরি কোনো ক্ষতি করে না। কিন্তু জলবাহক নলে লোহার শক্ত আস্তরণ পড়ে এবং গার্হস্থ্য কাজে ও শিল্পের ক্ষেত্রে এই জল সমস্যা সৃষ্টি করে।

যে সকল গ্রামাঞ্চলের ভূগর্ভস্থ জলে মাত্রারিক্ত আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড আছে সেই জল পরিশোধন করে ব্যবহার করা যায় ও করাও হচ্ছে। কিন্তু পরিশোধন পদ্ধতি ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে অনেক সমস্যা আছে, পরিবেশে ও জলে আর্সেনিক ও ফ্লোরাইডের পরিমাণ কমানোর কাজটা কেবল প্রযুক্তি দিয়ে হয়তো সম্ভবও নয়। আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড পরিশোধন ইউনিটগুলি ব্যয় বহুল। এ ছাড়া জল থেকে যন্ত্রের সাহায্যে আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড বের করার পরে যে দূষকরাশি (sludge) উৎপন্ন হয় তার সঠিক বন্দোবস্ত (ডিসপোজাল) না হলে পুনরায় জলের উৎস বেশিমাত্রায় দূষিত হতে পারে।

ভূপৃষ্ঠের জলকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা

পুকুর বা দীঘির বা নদীর জলে রাসায়নিক পদার্থের দূষণ কম, কিন্তু জীবাণু থাকে। পুকুর দীঘির/নদীর জলই বৃষ্টির জল ও ভূপৃষ্ঠের জল। ছোটো জনগোষ্ঠী বা গ্রামাঞ্চলে পুকুর বা দীঘির জল পরিশোধন করে সরবরাহ করা যায়। জল পরিশোধনের প্রধান উদ্দেশ্য অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকর ভাসমান, দ্রবীভূত ও জীবাণুর অপসারণ। জলের ভাসমান কঠিন পদার্থগুলির অপসারণ প্রক্রিয়া সহজ। কিন্তু জলে দ্রবীভূত পদার্থগুলির অপসারণ প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে শক্ত এবং অনেক ক্ষেত্রে খরচসাপেক্ষ। তাই ভূপৃষ্ঠের যে জল সরবরাহের আগে পরিশোধন করা হয়, সেই জলে দ্রবীভূত লবণ এবং রাসায়নিক যৌগ মাত্রাতিরিক্ত না থাকা বাঞ্ছনীয়। জলে 'কলয়ডাল' দ্রবণের মধ্যে থাকে তুলনায় বড়ো আকারের অণু। সেই কলয়ডাল মাপের পদার্থগুলি নিজে থেকে একে অপরের সঙ্গে মিশে বড়ো মাপের হয় না। এই কলয়ডাল পদার্থগুলিকে যুক্ত করে বড়ো করতে এবং সঙ্গে সঙ্গে থিতিয়ে পড়তে সাহায্য করে ফিটকিরি (alum) ব্যবহার; এবং জীবাণু নষ্ট করা হয় ব্লিচিং পাউডারের দ্রবণ মিশিয়ে এবং/অথবা অতিবেগুনি রশ্মির মাধ্যমে। কলকাতা শহরে দৈনিক চাহিদার প্রায় ৯০ শতাংশ গঙ্গানদীর জল পরিশোধিত করে ব্যবহার করা হয়।

এবার উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি গ্রামীণ অঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠের জলের পরিশোধন ও পরিবেশনের জন্য চালু কয়েকটি প্রকল্পের কথা বলি।

ছোটো ছোটো জনগোষ্ঠীর জন্য বা গ্রামের লোকেদের জন্য আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড আক্রান্ত জেলাগুলির মধ্যে চারটি জেলার (উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায়) চারটি ব্লকে ৪টি ছোটো (mini) জল পরিশোধন কেন্দ্র চালু করেছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ও পাবলিক হেলথ (যা সুলভের একটি অংশ) এবং ১০০১ ফনটেনস ফ্রান্স। সহযোগিতায় আছে স্থানীয় এনজিও-গুলি ও নানা স্থানীয় সংগঠন (মধুসূদনকাটি সমবায় কৃষি সমিতি, ওয়েস্টবেঙ্গল ভলান্টিয়ারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন, অক্ষয়নগর পল্লীশ্রী সংস্থা, শ্রীমায়াপুর বিকাশসংঘ)। উদ্দেশ্য, গ্রামীণ লোকেদের স্বাস্থ্য রক্ষায় নিরাপদ জল সরবরাহ ও পরিবেশন করে শিশুমৃত্যু কমানো ও মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন, ও আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড যুক্ত নলকূপের উৎসগুলির জল পানীয় হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করা। এর সঙ্গে গ্রামীণ বেকার যুবক ও যুবতীদের আর্থিক উপার্জনও হয়। ঐতিহ্যগতভাবে মধুসূদনকাটি ও সুভাষগ্রাম (উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা) পুকুরের জলকে পানীয় জল ও রান্নার কাজে ব্যবহার করার জন্য বিশুদ্ধকরণ করা হচ্ছে ভারতবর্ষের ও ফ্রান্স-এর প্রযুক্তিগত প্রয়োগবিদ্যার মাধ্যমে। বিশুদ্ধকরণ (treatment) প্রকল্পটি সচল রাখার জন্য নিরাপদ পানীয়জল বিক্রি ও পরিবহণের জন্য মূল্য ধার্য করা হয়েছে ২০ লিটার নিরাপদ পানীয় জল ১০ টাকা এবং পরিবহণ মূল্য ২

নদীর জল পরিশোধন করার প্ল্যান্ট

টাকা। এর ফলে ৩-৪ জনের (মহিলা/পুরুষ) কাজের সুযোগ ও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে। অন্যদিকে গ্রাম ও প্রাথমিক স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আর্থিক মূল্য ছাড়া জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

এইসব জায়গায় পুকুর / নদীর জল পরিশোধন পদ্ধতির সার-সংক্ষেপ করলে দাঁড়ায় এইরকম

১. পুকুর/নদীর জল সাধারণ পাম্পের সাহায্যে গোলাকার প্লাস্টিকের (৫০০০ লিটার) ট্যাঙ্কারে তোলা হয়।

২. জলের আবিলত্ব বা ঘোলাটেভাব নির্ণয় করে পরিমাণ মতো ফিটকিরি (Alum) দিয়ে দেওয়া হয়।

৩. গোলাকার জলাধারে জল দ্রুতগতিতে (২ মিনিট) ও মন্থর গতিতে (১৫-২০ মিনিট) মিশ্রণ করা হয়।

৪. রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্লোরাইডের দানা তৈরি হয় এবং এইগুলি ভাসমান কলয়ডাল কণাগুলিকে এবং অন্যান্য বড়ো ভাসমান কঠিন পদার্থগুলিকে গোলাকার জলাধারের নীচে থিতিয়ে ফেলে।

৫. এই গোলাকার জলাধারে কলয়ডাল কঠিন পদার্থ জমাট বাঁধা (floculation) ও থিতিয়ে পড়ার (sedimentation) দুই প্রক্রিয়াই ঘটে।

৬. গোলাকার জলাধারের উপরিভাগ থেকে পরিষ্কার জল নির্গত হয়ে ফিল্টারে আসে। ফিল্টারে বালি এবং নুড়িপাথর থাকে। এই ফিল্টারের নাম 'ধীর বালি ফিল্টার' (slow sand filter)। এটা জলে অবশিষ্ট সমস্ত ভাসমান কঠিন পদার্থ সরিয়ে ফেলতে সাহায্য করে।

৭. ফিল্টারের পরিশ্রুত জল স্বচ্ছ এবং ভাসমান কণামুক্ত, তবুও এই জলে সামান্য পরিমাণ জীবাণু থাকতে পারে।

৮. স্বচ্ছ ও প্রায় ভাসমান কণামুক্ত জল পরিষ্কার জলাধারে এসে জমা হয়। পরিষ্কার জলাধারে জল এরপর পাম্পের সাহায্যে সক্রিয় কার্বন ফিল্টারের মধ্য দিয়ে ভিন্ন সাইজের মেমব্রেন কার্টিজ-এর মধ্যে (60μ, 10μ, 5μ ও 1μ) পরিচালিত করে, তারপরে অতিবেগুনি রশ্মির মাধ্যমে অবশিষ্ট সামান্য জীবাণুকে সরিয়ে একেবারে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

৯. উপযুক্ত নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্ত জল ২০ লিটার বোতলে ভরে সিল করে ব্যবহারকারীর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয় বা ব্যবহারকারীরা সরাসরি পরিশোধন কেন্দ্র থেকে কিনে নিয়ে যায়।

১০. ২০০-৪০০ পরিবার প্রতিদিন এই ধরনের পরিশোধন কেন্দ্রের জল ব্যবহার করতে পারে।

১১. এই ধরনের ক্ষুদ্র প্রকল্পের উদ্দেশ্য কিন্তু কেবলমাত্র 'ক্ষুদ্র' নয়। উদ্দেশ্যগুলো হল—

- বৃষ্টির জল ব্যবহারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করা।
- ভূপৃষ্ঠের জলের ব্যবহারের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জলাধারের পুনঃস্থাপন করার সামাজিক চাহিদা তৈরি করা।
- জলসংরক্ষণ জলের অপচয় বন্ধ, নিরাপদ জল ব্যবহার, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধান প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব জনচেতনা বৃদ্ধির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
- সর্বস্তরের মানুষের সামাজিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ।
- গ্রামীণ মহিলা/পুরুষদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন।

শেষ কথা

ব্যবহারযোগ্য ও সুপেয় নিরাপদ জল স্বাস্থ্যলাভের অত্যাবশ্যক অঙ্গ। কিন্তু অন্তত এদেশে তার যথাযথ ব্যবস্থা নেই। সরকার এ ব্যাপারে সদর্থক পদক্ষেপ নিক, এটা যেমন আমাদের দাবি, অন্যদিকে তৃণমূল স্তর থেকে নানা উদ্যোগ ও পুরোনো ঐতিহ্যবাহী জল-সংরক্ষণ ব্যবস্থার সময়ানুগ পরিবর্তন, এ কাজগুলোও করতে হবে। এরকম সব কাজ যে পুরো সঠিক হবে, এমন না-ও হতে পারে, কিন্তু সেইসব প্রচেষ্টা যেন হারিয়ে না যায়, তার সমালোচনা-প্রয়োগ উন্নতিবিধান যেন চলতে থাকে, সেগুলি যেন সমাজের নিজস্ব উদ্যোগ হয়ে উঠতে পারে—এমনটাই কাম্য। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

মানসরঞ্জন মাইতি, টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট, মিনি রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই প্রোজেক্ট, ইন্টারন্যাশানল অ্যাকাডেমি অফ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ্, নয়া দিল্লি-৪৫।

টুকরো খবর

ওষুধ কোম্পানিগুলো বিক্রি বাড়ানোর জন্য মেডিক্যাল ক্যাম্প করে

ভারতে 'ফ্রি হেলথ ক্যাম্প'-এ বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির সেলস কর্মীরা মানুষকে পরীক্ষা করে দেখছে ও নানা ল্যাবরেটরি টেস্ট করছে, আর ডাক্তাররা তার বদলে সেই কোম্পানির ওষুধ লিখছেন—ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালের রিপোর্ট।

মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র মতে, এরকম কাজ বিধিসম্মত নয়, আর কেবলমাত্র একজন রেজিস্টার্ড মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার (অর্থাৎ ডাক্তার)-ই রোগী দেখতে পারেন, একজন লাইসেন্সধারী টেকনিশিয়ানই কেবল ল্যাব পরীক্ষা করতে পারে। কিন্তু বিএমজে (ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল)-এর রিপোর্ট বলছে, ভারতীয় ও বহুজাতিক সমস্ত রকম ওষুধ কোম্পানি, যেমন—অ্যাবট, বায়ার, গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইন, রোশে, স্যানোফি, এদের লাইসেন্সবিহীন কর্মীরা হেলথ ক্যাম্পে টেস্ট করছে।

বিএমজে-র নিবন্ধ বলছে, বস্তি বা মন্দিরের কাছে, বা এমনকী মধ্যবিত্ত এলাকায়ও, 'একটু সেবা করা'-র জন্য 'ফ্রি হেলথ ক্যাম্প'-এ ডাক্তাররা যোগ দেন, আর তার ফলে তাঁদের রোগী বাড়ে। ক্যাম্প ছাড়াও ডাক্তারদের চেম্বারে এরকম হেলথ ক্যাম্প আয়োজিত হয়। এসব জায়গাতেই যে কোম্পানির সেলস-কর্মীরা টেস্ট করে দেন, সেই কোম্পানির ওষুধগুলোই মূলত ডাক্তাররা লেখেন। অনেক সেলস-কর্মীই বিএমজে-র কাছে বলেছেন, তাঁদের বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে এইসব ক্যাম্প সাহায্য করেছে।

এই নিবন্ধ জানিয়েছে যে ওষুধ কোম্পানির লোকই বলেছেন কীভাবে একটা টেস্ট পজিটিভ হলেই একটু ওষুধের প্রেসক্রিপশন হয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। ডা. পঙ্কজ শাহ, মেয়ো ক্লিনিকের একজন ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ, আগে ছিলেন দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট মেডিক্যাল সায়েন্স-এর ডাক্তার। তিনি বিএমজে-কে বলেছেন যে এই ব্যাপারটা অনেক মানুষের ক্ষতি করতে পারে। ''যদি ডায়াবেটিসের প্রাথমিক পরীক্ষাটা ঠিকভাবেও করা হয়, অর্ধেক পজিটিভ ফল আসলে ভুল হতে পারে। সুতরাং বহু মানুষ এমন রোগের জন্য ওষুধ খাবেন যে রোগ তাঁদের আদৌ নেই, ফলে পার্শ্বক্রিয়ার ক্ষতিটা হবে, লাভ কিছু নেই।'' ডা. শাহ বলেন তিনি একে সরাসরি 'ম্যালপ্র্যাকটিস'-ই বলবেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের জয়েন্ট সেক্রেটারিকে এল শর্মা বলেছেন, কোনো ওষুধ কোম্পানি কোনো পরীক্ষা করে দিলে ডাক্তাররা তাদের ওষুধ লিখবেন, ''এ কাজ সম্পূর্ণ অনৈতিক'', এবং এমসিআই-এর নিয়মবিরুদ্ধ।

সেবাকার্যের মতো দেখায় এমন 'রোগী নির্ণয় প্রোগ্রাম' ভারতে খুব সাধারণ ঘটনা। এতে নতুন 'ক্রেতা' তৈরি হয় ও কোম্পানি বাজারের বড়ো অংশ কুক্ষিগত করতে পারে। শুধু তাই নয়, ডাক্তারদের ওষুধ কোম্পানির উপহার দেবার ওপর যে এমসিআই-বিধিনিষেধ আছে সেসব সত্ত্বেও কোম্পানিগুলো প্রেসক্রিপশন লেখা প্রভাবিত করতে পারে।

প্রসঙ্গত, অনেক বহুজাতিক কোম্পানিই কঠোর ব্যাবসা সংক্রান্ত নীতি মেনে চলার দাবি করে, আর তার ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফার্মাসিউটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্য, আর ১৯৮১ সাল থেকেই এই সংগঠনের এক আচরণবিধি আছে, ২০১২ সাল পর্যন্ত তার অনেকবার সংশোধন হয়েছে। ২০১৫-র প্রথমে ভারতের সব দেশি-বিদেশি ওষুধ কোম্পানিগুলো দাবি করে যে ২০১৫-র জানুয়ারিতে তাদের প্রোডাক্টগুলো বাজারে চালাতে স্বেচ্ছায় আরোপিত নীতিমালা 'Uniform Code of Pharmaceutical Marketing Practice' লাগু করেছে। বিএমজে-র নিবন্ধ ও 'নীতিসঙ্গত' মার্কেটিং নীতির পরিষ্কার লঙ্ঘন, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে।

সবদিক থেকেই জয়ের নীতি

অ্যাবট কোম্পানির সমস্ত ডিভিশনই হেলথ ক্যাম্প আয়োজন করে। ২০১১ সালের অ্যাবট কোম্পানির এক রিপোর্ট বলছে, ''এই ক্যাম্পগুলো হাজার হাজার মানুষকে টেস্ট, শিক্ষা ও চিকিৎসা পেতে সাহায্য করেছে।''

ভারতের 'থাইরয়েড বাজার'-কে নতুন প্রাণ জুগিয়েছে বলে অ্যাবট ইন্ডিয়া ডিসেম্বর ২০১২-তে এক 'সার্টিফিকেট অফ মার্কেটিং এক্সেলেন্স' পেয়েছে—কোম্পানির ওয়েবসাইট এমনটাই জানিয়েছে। অ্যাবট এর 'থাইরোনর্ম' থাইরক্সিন) অন্য সব ব্র্যান্ডের চাইতে বেশি দামি হওয়া সত্ত্বেও থাইরক্সিন-এর অন্য সব ব্র্যান্ডের চেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে। ১০০টি 'থাইরোনর্ম'-এর দাম যেখানে ১৫১ টাকা, সেখানে জাইডাস ক্যাডিলা কোম্পানির 'রক্সিনের'-এর ১০০টির দাম মাত্র ১১টাকা।

অ্যাবট ইন্ডিয়া-র ২০১১-র বার্ষিক রিপোর্ট জানাচ্ছে, ''একলপ্তে বহু রোগী ধরার 'স্ক্রিনিং', [থাইরয়েড রোগ ধরার] ডায়াগনস্টিক ক্লিনিক ও কিট ইত্যাদির মাধ্যমে থাইরোনর্ম এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে এখন এক নম্বর ব্র্যান্ড।''

গবেষণা সংস্থা আইএমএস হেলথ জানাচ্ছে, এখন থাইরোনর্ম ভারতের সর্বোচ্চ বিক্রির ১০টি ওষুধের অন্যতম। সস্তা দামের ব্র্যান্ড বছরে কয়েক মিলিয়ন ডলার বাঁচাতে পারত।

হ্যান্স হগারজেল, নেদারল্যান্ডের গ্রোনিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল হেলথ্-এর অধ্যাপক ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অত্যাবশ্যক ওষুধ ও ফার্মাসিউটিক্যালস নীতি-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর। তিনি বলেন, ''আমি বলব এ হচ্ছে কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব-এর লেবেল এঁটে বাজার ধরার কায়দা।''

গত বছরে ভারত বৃহৎ কোম্পানিগুলোর 'কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব' বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। অ্যাবট সিদ্ধান্ত নিয়েছে—'স্ক্রিনিং' আর হেলথ্ ক্যাম্প হবে তাদের মূল 'কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব'।

তথ্যসূত্র:

১. *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, ৩ ডিসেম্বর ২০১৫। ইন্টারনেটে http://timesofindiatimes.com/business/india-business/Drug-cos-use health-camps-to-push-sales/articleshown 50018895.cms-এ লভ্য।

২. *ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল* ২ ডিসেম্বর ২০১৫, ইন্টারনেট http://www.bmj.com/content/351/bmj.h6413-এ লভ্য।

সামুদ্রিক প্রাণীর সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেছে

'ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড'-এর রিপোর্ট জানাছে, ১৯৭০ সাল থেকে ২০১২—এই ৪২ বছরে সমুদ্রে জীবের সংখ্যা শতকরা ৪৯ ভাগ কমে গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটা সমুদ্রের জীবজগতের সম্পূর্ণ অবনমনের সূচক। এর কারণ হিসেবে অতি-নিবিড় মৎস্য-সংগ্রহ ও অন্যান্য পরিবেশগত পরিবর্তনকেই দায়ী করা হচ্ছে।

সামুদ্রিক মাছের মধ্যে শতকরা ২৯ ভাগ 'অতি-শিকার'-জনিত (over-fished) চাপের মধ্যে আছে, আর তার ওপর আরও শতকরা ৬১ ভাগ 'পুরোমাত্রায় শিকার' (Fully exploited) করা হয়েছে। টুনা, ম্যাকারেল, বোনিতো ইত্যাদি খাদ্য-মাছের পরিমাণ কমেছে শতকরা ৭৪ ভাগ। ব্লু ফিন ও ইয়েলো ফিন—এরা বিলুপ্ত হবার মুখে।

বিশ্বের প্রবাল প্রাচীরের শতকরা ৭৫ ভাগ বিপদগ্রস্ত, কেননা তাদের ওপরের আচ্ছাদন (Cover) গত ত্রিশ বছরে অর্ধেক কমে গেছে। সমস্ত সামুদ্রিক প্রজাতিগুলোর মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ থাকে প্রবাল প্রাচীর বা তার সংলগ্ন এলাকায়, আর ৮৫ কোটি মানুষ বেঁচে থাকার জন্য তাদের ওপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল। যদি বর্তমান হারে বিশ্ব-উষ্ণায়ন ও অম্লীভবন চলতে থাকে, তাহলে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রবাল প্রাচীরের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যেতে পারে—বিশেষজ্ঞদের এমনই মত।

সুন্দরবনের মতো ম্যানগ্রোভ এলাকা গভীর বিপদের সামনে। ১৯৮০ থেকে ২০০৫ সাল—এই ২৫ বছরের মধ্যে ম্যানগ্রোভ এলাকার শতকরা ২০ ভাগ, মানে ৩৬ লক্ষ হেক্টর ম্যানগ্রোভ-ভূমি, নষ্ট হয়ে গেছে। বিশ্বের বনভূমি বেশ দ্রুত নষ্ট হচ্ছে, কিন্তু ম্যানগ্রোভ অরণ্যের নষ্ট হবার হার তার সাড়ে তিন গুণ!

হাঙর-শিকারের হার বেড়েছে আগের তুলনায় তিনগুণ। হাঙর জাতীয় মাছ (স্কেট, রে-মাছ ইত্যাদি) এখন সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বিলুপ্তির মুখে, যদিও সর্বত্র তাদের অবস্থা এতটা খারাপ নয়।

'ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড'-এর রিপোর্ট 'লিভিং ব্লু প্ল্যানেট' বলছে, অতি-শিকারই হল এই বিপর্যয়ের মূল কারণ, কিন্তু বিশ্ব-আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে মহাসমুদ্রের অবস্থা আগের লক্ষ লক্ষ বছরের চাইতে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। সামুদ্রিক জীবজগৎ এমনিতেই অতি-শিকার আর দূষণের চাপে রয়েছে, তার ওপর বিশ্ব-উষ্ণায়ন আর আবহাওয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধি তাদের মৃত্যু ত্বরান্বিত করছে।

বর্তমান সমীক্ষাটি ১২৩৪টি সামুদ্রিক জীব আর তাদের ৫৮২৯টি বাসস্থান ধরে করা হয়েছে, যা কিনা আগে করা যেকোনো সমীক্ষার চাইতে দ্বিগুণ আকারের।

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫,
http://timesofindia.indiatimes.com/home/science/Marine-life-dipped-by-50-in-40-years/articleshow/48993859.cms ও
http://perfscience.com/content/2142543-wwf-warns-marine-population-has-fallen-almost-50-1970

ভিডিও গেমস

ছোটো ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে। কেউ কেউ তাদের স্কুলজীবন শুধুমাত্র ছেলে বা শুধুমাত্র মেয়েদের স্কুলে কাটিয়ে দিল, কেউ-বা কো-এডুকেশন স্কুলে অর্থাৎ যেখানে ছেলে মেয়ে উভয়ে পড়ে সে রকম স্কুলে পড়ল। গ্রাম থেকে শহর, বাচ্চাদের খেলার একটা বড়ো অঙ্গ হল ভিডিও গেমস। এই শিক্ষা এবং খেলার ওপর সমীক্ষা করে বেশ মজার কিছু তথ্য পাওয়া গেছে।

একটি শিশু বড়ো হওয়ার সময় তার বাবা-মায়ের আদর-যত্ন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সে কী খেলছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এগুলোর প্রভাব পরবর্তীকালে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে।

ভিডিও গেমসের কিছু পরিসংখ্যান দেখা যাক—

১. শতকরা ৪২ ভাগ খেলার মধ্যে কোনো মহিলা চরিত্র নেই
২. খেলাগুলোর মধ্যে শতকরা ২৮ ভাগ মহিলা আসে যৌনতাধর্মী চরিত্র নিয়ে
৩. খেলার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগের বেশি হচ্ছে হিংসার সঙ্গে জড়িত
৪. শুধুমাত্র শতকরা ২৭ ভাগ সামাজিক দিক দিয়ে স্বীকৃত
৫. শতকরা ২১ ভাগ হিংসা বা আক্রমণ প্রকাশ পায় মেয়েদের মাধ্যমে

ছেলেদের পড়া, মেয়েদের পড়া, কো-এডুকেশন

● আমরা ম্যাগাজিন পড়ি, আবার ম্যাগাজিন প্রকাশও করি। লক্ষ্য থাকে যত বেশি সংখ্যক মানুষ আমাদের চিন্তাভাবনা ম্যাগাজিনে পড়তে পারেন। গবেষণা করে দেখা গেছে মেয়েরা মূলত রূপচর্চা সম্পর্কিত খবর বেশি পড়ে এবং ছেলেরা শরীরচর্চা সম্পর্কিত খবর বেশি পড়ে। এটা ছেলে আর মেয়েদের প্রকৃতিদত্ত প্রভেদ, তা কিন্তু প্রমাণিত নয়। এ হল এক সামাজিক নির্মাণ।

● পাঞ্জাবে ৮টা জেলায় বিভিন্ন প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বের ওপর স্কুলের প্রভাবের সমীক্ষা করা হয়। এখানে একদিকে কেবলমাত্র ছেলে বা মেয়েদের আলাদা স্কুল এবং আর একদিকে ছেলে-মেয়ে উভয়ের অর্থাৎ কো-এডুকেশনে পড়া ছাত্রছাত্রীদের ওপর সমীক্ষা চালান হয়। দেখা গেছে কেবলমাত্র ছেলে বা মেয়েদের স্কুলে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ বেশি ইতিবাচক। তারা অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয়। তুলনায় কো-এডুকেশনে পড়া ছাত্র-ছাত্রীরা গম্ভীর, ভীত এবং নির্ভরশীল।

খাদ্য-সাপ্লিমেন্ট স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে

১৫ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে *দি নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন*-এ একটি সমীক্ষা প্রকাশিত হয়। আমেরিকার ওষুধ ও খাদ্য নিয়ামক সংস্থা (Food and Drug Administration, সংক্ষেপে এফডিএ), ও রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (Center for Disease Control and Prevention, সংক্ষেপে সিডিসি)-এ-দুয়ের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এই সমীক্ষার নেতৃত্ব দেন। বিগত দশ বছর ধরে সে-দেশের অনেকগুলো হাসপাতালের জরুরি রোগীর বিভাগে রোগীদের রোগ-উপসর্গ-চিকিৎসা ইত্যাদি এই গবেষকরা খতিয়ে দেখেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই সমীক্ষায় জানা গেছে, 'ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট' জনিত নানা ক্ষতির কারণে প্রতি বছর সে দেশে ২০,০০০-এরও বেশি মানুষ জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিতে বাধ্য হন। এই ধরনের ক্ষতিকারক 'ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট'-গুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে কমবয়সিদের ওজন কমানোর জন্য ও শক্তি বাড়ানোর জন্য দেওয়া নানা (কু) খাদ্য, যা খেয়ে তাদের হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যা হয়েছে।

এই সমীক্ষাটিই প্রথম যা গুরুতর ক্ষতি ও হাসপাতালে ভর্তির সঙ্গে ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টের সম্পর্ককে নির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করল। ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টের ইন্ডাস্ট্রি বিশাল, আমেরিকায় বছরে ৩২ বিলিয়ন ডলারের শিল্প, এবং তা দ্রুত বাড়ছে। গত বছর এর ওপর নজরদারির দাবি জোরদার হয়, এবং ভেষজ দ্রব্য (হার্বাল প্রোডাক্ট)-গুলোর ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব আসে। ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির সমালোচকরা বর্তমান সমীক্ষার ভিত্তিতে বলছেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই জিনিসগুলোর ব্যাপারে সরকার পক্ষের ঢিলেঢালাভাব বহু মানুষের শারীরিক ক্ষতির ঝুঁকির কারণ। কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রির মুখপাত্ররা বলছেন, এইসব জিনিস আমেরিকার অর্ধেক মানুষ ব্যবহার করেন, সুতরাং এই সমীক্ষা থেকে বোঝা যাচ্ছে তাঁদের খুব অল্প অংশই গুরুতর ঝুঁকি বা ক্ষতির সম্মুখীন।

যেসব ক্ষতি এই ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টের কারণে হয়েছে সেগুলো হল—ভয়ানক অ্যালার্জি, হৃদ্‌যন্ত্রের গণ্ডগোল, গা-গুলানো ও বমি। আর যে সমস্ত ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট এইসব ক্ষতি করেছে তারা হল হার্বাল বড়ি, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ভিটামিন ও খনিজ লবণ। যাদের এজন্য শরীর খারাপ হয়ে হাসপাতালে আসতে হয় তাদের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়; প্রতি বছরে এজন্য ২১৫০ জন হাসপাতালে ভর্তি হন। তুলনা করে দেখলে বলতে হয়, চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন করা ওষুধের পার্শ্বক্রিয়ায় এর ৩০ গুণ মানুষ জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিতে বাধ্য হন।

একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টের কারণে জরুরি বিভাগে চিকিৎসা মানুষদের বেশিরভাগ কমবয়সি, কিন্তু চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন করা ওষুধের পার্শ্বক্রিয়ায় ভোগেন মূলত বয়স্ক মানুষেরা। সিডিসি-র ডা. অ্যান্ড্রু গেলার, এই সমীক্ষকদলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, বলেন যে এই বৈপরীত্য খুব উল্লেখযোগ্য।

২০ থেকে ৩৪ বছর বয়সি যারা ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টের জন্য জরুরি বিভাগে দেখাতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের অর্ধেক ওজন কমানোর জন্য বা শক্তি বাড়ানোর জন্য এইসব জিনিস খেয়েছিলেন, আর বুকে ব্যথা, বুক ধড়ফড়, বা হৃদ্‌যন্ত্রের এলোমেলো গতির জন্য হাসপাতালে এসেছিলেন।

সমীক্ষকদল জানান, এইসব জিনিসে টিপিক্যালি থাকে নানা ধরনের ভেষজ (হার্ব), তাদের নির্যাস, আর ইন্টারনেটে, ম্যাগাজিনে ও টিভিতে এদের বিজ্ঞাপন খুব দেখা যায়। আমেরিকায় এগুলোর পরিচিত ব্র্যান্ড হল হাইড্রক্সিকাট, জেনাড্রাইন, র‍্যাস্পবেরি কিটোন ও ব্ল্যাক জ্যাক এনার্জি। ওজন কমানোর জন্য বা শক্তি বাড়ানোর জন্য সাপ্লিমেন্টগুলো এর আগেও গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করেছে এমন উদাহরণ আছে—২০১৩ সালে এক ঘটনায় ৯৭ জন অসুস্থ হন, একজন মারা যান; ৩জন রোগীকে লিভার ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট করে চিকিৎসা করতে হয়।

তথ্যসূত্র : *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, ১৭ অক্টোবর ২০১৫ ও The New England Journal of Medicine, N Engl J Med 2015; 373: 1531-1540 October 15, 2015. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa1504267 ১৭ অক্টোবর ২০১৫ ইন্টারনেটে লব্ধ।

সংযোজন: এ তো হল খোদ আমেরিকার কথা। আমাদের দেশে অবস্থা আরও অনেক কঠিন ও জটিল। আমাদের পুরোনো ঘরানার নানা 'শক্তিবর্ধক পুষ্টিদায়ক বলকারক' খাদ্য ও পানীয় তো আছেই, তার সঙ্গে আছে চিকিৎসকদের অকারণে টনিক-ভিটামিন লেখা ও চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই ওষুধের দোকান থেকে মুদির দোকানে নানারকম 'ম্যাজিক খাদ্য' কিনে খাওয়া। এর সঙ্গে ক্রমশ বাড়ছে এক নতুন ব্যাধি, 'জিম' ও শারীরিক কসরতের নানা আখড়ায় চালু ওজন কমানোর জন্য বা শক্তি বাড়ানোর জন্য দেওয়া নানা সাপ্লিমেন্ট। আমেরিকা-ইউরোপের নানা কুঅভ্যাস দ্রুত আমদানি করতে আমাদের খামতি নেই কোনোকালেই। কিন্তু আমাদের দেশে এইরকম সমীক্ষা নেই, সিডিসি ও এফডিএ-র মতো কোনো শক্তিশালী নিয়ামক সংস্থা নেই, আইন যা আছে সেটুকু প্রয়োগ করার ব্যবস্থা বা সদিচ্ছা কোনোটাই নেই। তাই, 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' অবলম্বন করে, যাবতীয় 'শক্তিবর্ধক পুষ্টিদায়ক বলকারক' খাদ্য-পানীয় টনিক-ভিটামিন-ভেষজ-কেমিক্যাল সব কিছুর থেকে নিজ দায়িত্বে দূরে থাকাই এ দেশে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

হেঁসেলের কথা

মধু লেবু খেয়ে কি রোগা হওয়া যায়?

এখন এটা খুব চলছে সকালে মধু আর পাতিলেবু খেলে রোগা হওয়া যায়। অনুপান নানারকম এক চামচ মধু/আধখানা লেবু, এক চামচ মধু/একটা লেবু, ঠাণ্ডা জলে/গরম জলে মিশিয়ে ইত্যাদি। এটা কি সম্ভব? দেখা যাক।

মধুতে আছে ফ্রাকটোজ এবং গ্লুকোজ, যে দুটো আদতে শর্করা—তাই মধু খেতে মিষ্টি। এ ছাড়া আছে কিছু জৈব অ্যাসিড—গ্লুকিউরোনিক অ্যাসিড, অ্যাসেটিক অ্যাসিড, বিউটাইরিক অ্যাসিড ইত্যাদি। এগুলো কোনোটাই ওজন কমাতে সাহায্য করে না। বরং মিষ্টতার জন্য বিজ্ঞানসম্মত ওজন কমানোর পথ্য ব্যবস্থায় মধুকে এড়িয়ে চলা হয়। আর লেবুতে আছে সাইট্রিক অ্যাসিড এবং ভিটামিন-সি। ভিটামিন-সি অনেক এনজাইমের কো-ফ্যাক্টর হিসেবে দেহের নানা বিপাকক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ক্ষতস্থান সারাতে এবং রক্তজালিকা দিয়ে রক্তপাত নিয়ন্ত্রণে ভিটামিন-সি-র ভূমিকা আছে। কিন্তু রোগা হতে মধুর ভূমিকার কোনো প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়নি।

সাধারণভাবে একজন মানুষের উচ্চতা থেকে তার আদর্শ শারীরিক ওজন (Ideal Body Weight) মাপা হয়। এবার সে কেমন কাজ করছে অর্থাৎ বসে থাকা কাজ না প্রচুর ঘোরাফেরার কাজ করে, তার ওপর নির্ভর করে একটা ফর্মূলা দিয়ে তার দিনে কত ক্যালরি প্রয়োজন সেটা নির্ণয় করা হয়। এবার দেখা হয় সে বিভিন্ন খাবারের মাধ্যমে কত ক্যালরি দিনে নিচ্ছে। বলাই বাহুল্য যারা কোনো রোগের কারণ ছাড়াই মোটা বা বেশি ওজনের, তারা বেশি ক্যালরি নেয়। তাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে সাধারণত দু-সপ্তাহে দৈনিক ৫০০ ক্যালরি কমার মতো পথ্য ব্যবস্থা করা হয়, খাবারের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট থেকে ৬০-৭০%, প্রোটিন থেকে ১০-১৫% এবং ফ্যাট থেকে ২০-২৫% ক্যালরি নেওয়া হয়। এবং কোন খাদ্য থেকে এই ক্যালরি পাওয়া যাবে সেটা জানিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু অনেকেই বলছেন মধু-লেবুতে কাজ হচ্ছে, আর সত্যিই অনেকের ওজন কমছে। কী করে? ভালো করে জিজ্ঞাসা করে দেখা গেছে যাদের ওজন কমছে তারা পুষ্টি-বিশেষজ্ঞের কাছে না গিয়েও নিজেদের মতো করে খাদ্যাভ্যাসে বদল আনে। মোট খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি-র দৌলতে সবার একটা ধারণা হয়েছে কোন কোন খাবারে ক্যালরি বেশি। সেগুলো যতটা সম্ভব বর্জন করে। কেউ কেউ সঙ্গে সঙ্গে নানারকম এক্সারসাইজ করে। আর এগুলোই তাদের ওজন কমার কারণ। কিন্তু কৃতিত্ব পায় মধু-লেবু।

কিন্তু কেন মধু, কেন লেবু, এখানে একটু পেছনে তাকানো যাক। আমরা যা কিছু সুন্দর তাকে 'মিষ্টি' বলি, সে 'হাসি' থেকে 'চরিত্র' সবকিছু। আর তার চরম প্রশংসা করতে বলা হয় 'মধুর মতো মিষ্টি'। তা ছাড়া এই মধু জড়িয়ে আছে ধর্মীয় সংস্কৃতিতেও। দেবদেবীর পুজোতে মধু লাগে। আর লেবু, সেখানে আবার আধা-বিজ্ঞান জড়িত। সাইট্রিক অ্যাসিড ছাড়া লেবুতে আছে প্রচুর ভিটামিন-সি। আর ভিটামিন কথাতেই একটা সর্বরোগহর গন্ধ আছে। ভিটামিন-সি খেলে সর্দি কাশি, পেটের অসুখ এমনকী ক্যান্সারও নাকি সেরে যায়। এরকম কথা ট্রেনে বাসে হরবখত শোনা যায়। তো এহেন ক্ষমতাসম্পন্ন ভিটামিন-সির পক্ষে একটু চর্বি গলিয়ে মানুষকে রোগা করা তো যাকে বলে 'বাঁয়ে হাত কা খেল'। তাই পরম্পরা এবং বিজ্ঞান (আধা হলেই-বা) অর্থাৎ মধু এবং লেবু জুটি শচীন-সৌরভ জুটির মতো হিট।

advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা বিগত ৫০ বছরের বেশি ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯

ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২